মেঘবালিকার জন্য

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

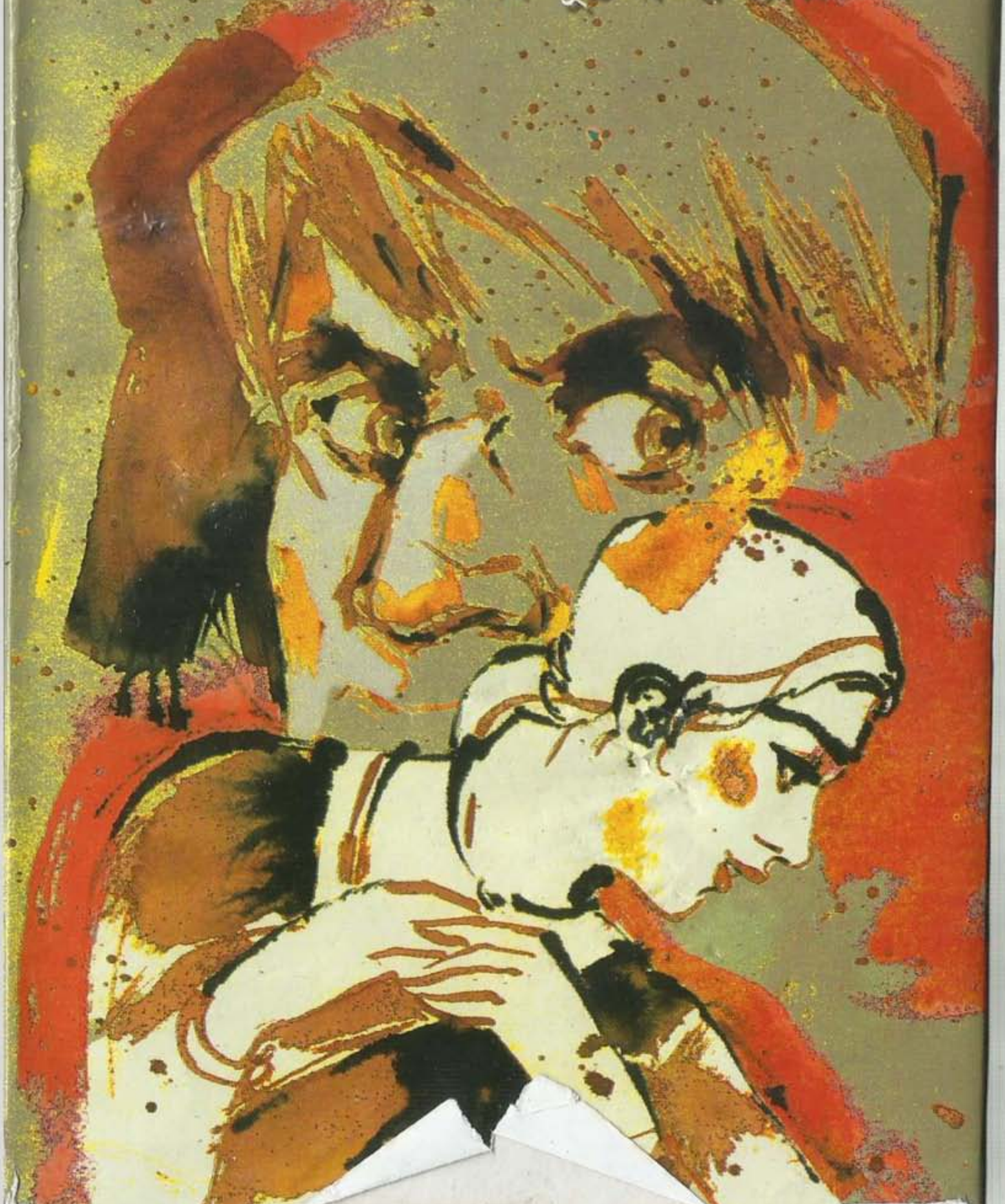

মেঘবালিকার জন্যে

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

MEGHBALIKAR JANYA
by ALOLIKA MUKHOPADHYAY
SAHITYAM
18B Shyama Charan Dey Street
Kolkata 700 073
Rs. 50.00

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক

নির্মল কুমার সাহা

সাহিত্যম্

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান

নির্মল পুস্তকালয়

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন

পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স

২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রণ

প্রিন্টিং সেন্টার

১ ছিদাম মুদি লেন

কলকাতা-৭০০০০৬

দাম : ৫০ টাকা

এতে আছে

জয়কিশনগঞ্জের গল্প ৭
মেঘবালিকার জন্যে ৬৩

জয়কিশনগঞ্জের গল্প

কবুতর হালাল মিট গ্রোসারি অ্যান্ড ভিডিও কর্নারের দরজায় দাঁড়িয়ে মেহরীন ডাকল—"স্টোরের ঐ ধারে গিয়া বসো। বাংলা পত্রিকা আছে। চাইলে টিভি দেখতে পারো।"

হাতের ব্যাগ পেছনের তাকে রেখে মেহরীন চাবি দিয়ে ক্যাশ রেজিস্ট্রার খুলল। দোকানে তখনো লোকজন আসেনি। দাড়িওলা রোগা লোকটা কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে পটল বার করছিল। মেহরীনের কথায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেবীর দিকে চেয়ে হাসল— "দুই দিন হয় নাই এদেশে আসেছ। টিভির ইংরাজি বুঝব নাকি?

মেহরীন মাথার কালো ওড়না আলগা করে, চোখে চশমা পরে একটা লিস্ট পড়ছিল। লোকটার কথার জবাব দিল না। দেবী তখনো দোকানের মাঝপথে দাঁড়িয়ে। মাত্র দুদিন আগে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছে। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় আকাশ-ছোঁয়া বাড়িঘর, নানা রঙের বড় বড় গাড়ি দেখে আমেরিকা সম্পর্কে

ওর এতদিনের ধারণাটা প্রায় মিলে যাচ্ছিল। কিন্তু আজ সকালে এই পাড়াটায় এসে আমেরিকায় আছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। মেহরীনের সঙ্গে দোকানে ঢুকে আরও অবাক। দেওয়ালে মস্ত পোস্টার লাগানো। ওপরদিকে মাছ আর মুরগির ছবি। নীচে বড় বড় করে লেখা—বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত আপনার পছন্দনীয় মাছ ও মাংসের বিপুল সম্ভার। পদ্মার ইলিশ, সিলেটের ট্যাংরা, ঢাকার বিখ্যাত চানাচুর, আলাউদ্দীনের লাচ্ছি সেমাই, মৈমন সিং-এর খেজুরের গুড়। কালিজিরা, চাল .... পোস্টার থেকে চোখ সরিয়ে দেবী দেখল দোকানে লোকজন ঢুকছে। দাড়িওলা লোকটা কাউন্টারের পেছনে মেহরীনকে সাহায্য করতে গেল। কেউ পাবদা মাছ চাইছিল। লোকটা ফ্রিজার খুলে লম্বা লম্বা মাছের প্যাকেট বার করল। জিন্‌স পরা এক মহিলা পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে পুঁইশাক কিনছে। তার পেছনে দাঁড়ানো বেঁটেমতো লোকটা কুমড়োর ফালি আর নারকেল হাতে নিয়ে কচুর লতির খোঁজ করছে। দেবী মাঝেসাঝে কচু খেয়েছে। তার লতি আবার কী জিনিস ? আমেরিকায় এসেও লোকে পুঁইশাক কেনে, কচু খায় দেখে ওর ঠাকুমার কথা মনে হচ্ছে। ঠাকুমা বলে আমাদের গরিবের সংসারে কচু, ঘেঁচু, কুমড়ো ছাড়া খাব কী ? দেবী এখন দেখছে বড়লোকেরাও কুমড়ো খায়।

"কী হইল? খাড়ায়ে আছো ক্যান ? বাংলা ভিডিও চালিয়ে দিব?" দাড়িওয়ালা লোকটা দেবীর গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ও একটু সরে গিয়ে বলল— না। একটা নিউজ পেপার দেবেন? ইন্ডিয়ার কাগজ।"

লোকটা মাথা নেড়ে হাসল— ইন্ডিয়ান কিছু নাই। বাংলাদেশি কাগজ আছে "দুই/তিনটা। ঐ ধারে রাখা আছে। বইস্যা কাগজ পড়ো।"

দেবী "দেশবিদেশ" নামে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে দোকানের পেছনদিকে প্লাস্টিকের চেয়ারে গিয়ে বসল। ওদিকে ক্যাসেটে গান শুরু হয়েছে সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী। দেবী পত্রিকার পাতা উল্টে দেখছিল। বাংলাদেশের খবর, নিউইয়র্কের খবর তার এই এলাকার দোকান বাজারের বিজ্ঞাপন। কবুতর হালাল মিট, গ্রোসারির বিজ্ঞাপনও আছে। নীচে লেখা—হালাল গোস্ত, খাঁটি সরিষার তেল ও শুঁটকি মাছ। আরো পাবেন আম ও জলপাইস রকমারি আচার এবং পটল, কাঁকরোল, কাঁঠাল বিচি, ডাঁটা ও পানিকচুসহ দেশি সবজি। ভিসা, মাস্টার্স কার্ড ও আমেরিকান এক্সপ্রেস গ্রহণ করি .... কাগজ পড়তে পড়তে দেবীর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। অসময়ে ঘুম পাচ্ছে। কালও অনেকরাতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভেতর একটু গরম লাগছিল। দেবী উঠে জানলার কাচ তুলে দিতে পেছনের ঝোপঝাড় থেকে অচেনা ফুলের গন্ধ গিয়ে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া এল। দেবী জানলা দিয়ে রাতের নিস্তব্ধ শহর দেখছিল। এত উঁচু বাড়িতে কখনো থাকেনি। সব কিছুই কত দূরে মনে হয়। কখন রাজা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। দেবী নিচু গলায় বলল—"উঠে পড়লি কেন ? বাথরুমে যাবি ?

রাজা উত্তর দিল না। রোগা শরীরে নতুন কেনা পায়জামাটা ঢলঢল করছে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকা ওর ম্লান মুখ দেখে দেবীর মায়া লাগছিল। ভাই-এর পিঠে

হাত রেখে ডাকল—"চল্ শুয়ে পড়ি। কাল আমাদের সকালে বেরোতে হবে।"

রাজা সাড়া দিল না। দূরে অন্ধকার আকাশের বুক চিরে প্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দ ভেসে আসছিল। লাল আলোর বিন্দু মিলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে রাজা বলল—" মা যে এখানে আসবে না তুই জানতিস?"

—"কে বলল মা আসবে না? বোকার মতো এসব ভেবে তুই মনখারাপ করছিস। এতবড় ছেলে। কটা মাস মাকে ছেড়ে থাকতে পারবি না।"

রাজা তখনো গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—"মা আর পাপু যদি না আসে, আমি এখানে থাকব না।"

রাজার গলার আওয়াজ বেড়ে যাচ্ছে শুনে দেবী ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করল—"রাজা, কত খরচ করে বাবা আমাদের নিয়ে এল। তুই ভালো স্কুলে ভর্তি হবি। আমি তো আছি। মা এবছরেই পাপুকে নিয়ে চলে আসবে। ঠাকুমার একটা ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো।

বড় অসহায়, বিপন্ন শোনাল রাজার গলার স্বর—"তুই জানিস না দিদি। বাবা আজ বলল মা নাকি এখানে আসতে চায় না। তাহলে আমাদের নিয়ে এল কেন?"

মেহরীনের ডাকে দেবীর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। দোকানের ভেতর গান বাজছে। লোকজনের কথাবার্তা চলছে। ও তারই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল কখন? মেহরীন হাসছে—"আজ বাসায় থাকলে পারতে। জেট্ ল্যাগ হইতাসে। নাও লাঞ্চ আনছি। ধরো। ওদিকে কাস্টমার দাঁড়াইয়া আছে।"

কাগজের প্লেটে খাবার ধরিয়ে দিয়ে মেহরীন কাউন্টারে ফিরে গেল। দেবীর ঘুম কাটতে চাইছে না। হাতে প্লেট নিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ পায়ের কাছে ভারী মতো কিছু ঠেকল। তাকিয়ে দেখল বিশাল পেঁয়াজের বস্তা। তার ও প্রান্ত ধরে দুটো লোক টানতে টানতে রাস্তায় নেমে যাচ্ছে। দেবী ওর তেরো বছরের জীবনে কখনো এক সঙ্গে এত পেঁয়াজ দেখোনি। আমেরিকায় লোকে এত বেশি বেশি বাজার করে কেন ? বরফে জমানো রুইমাছ, ইলিশমাছ, কইমাছ সবই একদিনে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। টাকা থাকলেও কত খেতে পারে মানুষ? দেবী তো বিয়েবাড়িতে গিয়েও দুটোর বেশি মাছ খেতে পারে না।

কাগজের প্লেট থেকে নানরুটি দিয়ে ঘুগনি খেতে খেতে দেবী ভাবছিল ভাইটা কী খেল কে জানে? সকালে ও যখন মেহরীনের সঙ্গে বেরোল, রাজা তখনো বালিশ আঁকড়ে ঘুমোছিল। বাবা বলল পরে ওকে নিয়ে বেরোবে। আজ শনিবারে বাবার বোধহয় ছুটি। হঠাৎ দেবীকে কেন যে দোকানে পাঠিয়ে দিল। সারাদিন একটা দোকানে বসে থাকা যায়? ওর রাজার সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। কাল রাতে যা শুনেছে, মনে হয় কথার কথা। বাবার কথা রাজা বুঝতে পারেনি। তবু দেবী একবার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে। ও এটুকু বুঝেছে, মা অনেকদিনই মেহরীনের কথা জানে। বাবাও এতদিন ওদের আমেরিকায় আনার চেষ্টা করেনি। মাঝে মাঝে নিজে কলকাতায় ঘুরে আসত। দু বছর আগে হঠাৎ ঠিক করল দেবী আর রাজাকে নিয়ে আসবে। ওদের বয়স বেড়ে গেলে বাবা আর স্পনসর করতে পারবে না। পাপু অনেক ছোট। ওকে স্পন্‌সর করার তাড়া নেই। দাদু, ঠাকুমাকে রেখে মার পক্ষেও চট

করে আসা সম্ভব নয়। বাবা মাকে কী বুঝিয়েছিল কে জানে? মা বোধহয় ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পাঠাতে রাজি হয়ে গেল। তখন তো এটাই ঠিক ছিল, দাদু আর ঠাকুমাকে পরে বারাসাতে ছোটকাকার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ঠাকুমা অবশ্য রাজি হচ্ছিল না। গতবছর দাদু মারা গেল। দেবী শুনেছে মা যখন পাপুকে নিয়ে চলে আসবে, রাঙাপিসি ঠাকুমাকে নিয়ে যাবে। মা যে বাবার কাছে আসতে চায় না, সে দেবীর চেয়ে বেশি আর কে জানে? কিন্তু ওদের ছেড়ে মা থাকবে কী করে?

হঠাৎ হাসির শব্দে দেবী দরজার দিকে তাকাল। সালোয়ার কামিজ পরা সুন্দর দেখতে এক মহিলা ভীষণ হাসছে। যার কথায় এত হাসি, সে নিশ্চয়ই ওর বর। সে মজা করে বলছে—"আপনার মাংস যেমনই হোক, আমাদের বিশেষত্ব আপনার মাংস কুচি কুচি করে কাটা। এবং কিমা বানানো।"

দোকানের লোকজনও হাসছে। মেহরীন কাউন্টার থেকে বলে উঠল—"মাংসের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখে মজা পাইসেন ? পানের বিজ্ঞাপন দ্যাখেন নাই? ঐ যে সেভেনটি ফোর স্ট্রিটে নতুন একটা পানের দোকান খুলসে, দেখসেন? নাম দিসে পুরস্কার প্রাপ্ত পানের দোকান 'পান মহল'। ফারুক ভাই, পানের নামগুলি বলেন তো।"

দাড়িওলা ফারুক লোহার মই-এর মতো একটা সিঁড়িতে চড়ে উঁচু তাক থেকে প্যাকেট নামাচ্ছিল। মেহরীনের কথায় ওখানে দাঁড়িয়েই গলা ফাটিয়ে শুরু করল— "সালিমশাহী পান, শীষমহল, বালুচি পান, দুল্হন এক রাতকি, আই লাভ ইউ পান। আরো কত নাম দিসে ! স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিবার আগে সাক্সেস

পান খাইলে ফার্স্ট হইব। বড় চাকরির ইন্টারভিউতে যাইবার সময় এক খিলি ম্যানেজমেন্ট পান। দাঁতগুলির রং চিন্তা করেন!"

দেবীর এত হাসাহাসি ভালো লাগছিল না। কতক্ষণ ধরে এখানে বসে আছে। বাইরে মনে হয় বিকেল হয়ে এল। কটা বাজল এখন? দোকানে একটা ঘড়িও নেই। এরা কত রাত অবধি দোকান খুলে রাখে? অধৈর্য হয়ে দেবী চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দেখলেন মেহরীন ফোনে কথা বলছে। ওকে দেখে ফোন ধরে রেখেই জিজ্ঞেস করল—"বাসায় যাইতে চাও? তারাও এইমাত্র ফিরসে। তোমার ভাইরে লইয়া সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরসে। সে তো এখনই ঘুমায়ে পড়সে।"

দেবী বলল—"ইস্, আজ রাত্তিরেও বোধহয় ভালো করে খাবে না। কাল দেখলেন তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিচ্ছু খেল না আমাকে এবার বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন?"

ফারুককে ডেকে মেহরীন দেবীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে বলল। দেবী ইতস্তত করছে দেখে মেহরীন তাড়া দিল—"যাও। বাসায় গিয়া বিশ্রাম করো। রাতের খাবার ফ্রিজে রাখা আছে। বাবারে, বলবে মাইক্রোওয়েভে গরম কইরা নিতে। মাত্র দুদিনের চেনা একজন মানুষ ওর বাবার চেয়ে ঢের ভালো ব্যবহার করছে। বাবা তো ওকে সকাল থেকে বাড়ি ছাড়া করার জন্য ব্যস্ত। রাজাকে নিয়ে বেড়াতে গেল। দেবীর কথা একবারও মনে হল না মেহরীন ওদের কেউ নয়। তবু ওরা আসার পর মেহরীন একটুও বিরক্তি দেখায়নি। মা তো সেই ভয়টাই পেয়েছিল। দেবীর ইচ্ছে করছে মেহরীনও যদি ওর সঙ্গে এখন বাড়ি ফিরে যায়। সে কথা

বলতে মেহরীন হাসল——"আমার তো বাসায় ফিরতে নয়টা বাজবে। তুমি আর দেরি কইরো না।" কাস্টমারদের জিনিস ব্যাগে ভরতে ভরতে মেহরীন ফারুককে তাড়াতাড়ি দোকানে ফিরে আসতে বলল। সন্ধের পরেও ভিড় কমছে না। দেবী ফারুকের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এল।

পথের দুধারে ভারতীয়, বাংলাদেশি, পাকিস্তানিদের সারি সারি দোকান। ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেসের আলো ঝলমলে শো-কেসে শাড়ি আর ল্যাহেঙ্গাচোলি পরা মানুষের মতো পুতুলগুলো দেখতে দেখতে দেবী একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। গয়নার দোকানের বাইরের শো-কেসে সোনার ঝালরের মতো দেখতে বড় বড় হার। লাল, নীল, সবুজ পাথরের সেট। সাদাগুলো নিশ্চয়ই ডায়মন্ড। দেবী মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ফারুক এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আবার চলতে শুরু করল।

ফারুক সমানে বকবক করে যাচ্ছে—"এই রাস্তার নাম জ্যাকসন হাইট্স। অবাঙালিরা নাম দিসে জয়কিশন হাইটস্। এই বড় দিশি বাজার আমেরিকার কোথাও নাই। এক সময়ে সবই সাহেব পাড়া সিল। এখন আমরা দখল করসি। কোরিয়ানরাও কম যায় না। ফ্লাশিং-এর দিকটায় যদি যাও, মনে হইবে কোরিয়াতে ঘুরতাসো।"

সাবওয়ে চড়ে দেবীরা যখন অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছল তখনও আটটা বাজেনি। ফারুক ওকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। অনিল বসে বসে টিভি দেখছিল। রাজা একটা নতুন খেলনার বাক্স খুলে বসেছে। কার্পেটে নতুন একজোড়া জুতো। দেবীকে দেখে উৎসাহিত হয়ে বলল—"তুই কেন আমাদের সঙ্গে গেলি না রে?

আজ সারাদিন কত ঘুরলাম। সাব-ওয়ে চড়ে ম্যান্‌হাটনে গেলাম। বাবা তোকে একবার ফোন্‌ও করল......।"

দেবী কিছু বলার আগেই অনিল ওকে কাছে ডাকল—"আয়, এখানে এসে বোস্। সারাদিন কী করলি? জ্যাকসন হাইট্‌স্-এর দোকান-বাজার দেখলি?"

দেবী মাথা নাড়ল— "হ্যাঁ, আসার সময় দেখছিলাম। —" "লাঞ্চে কী খেলি?"—"রুটি, ঘুগনি। একটা মিষ্টি।" দেবী ছাড়া ছাড়া উত্তর দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। বেরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল—"রাজা, একবার ঘরে আয় তো। রাজা আসার পর দেবী গম্ভীর গলায় জানতে চাইল—"তুমি আজ চান করেছিলে?"

—"নাঃ। কাল করব। সকালে শীত করছিল।" দেবী ধমক দিল—"বাজে বকিস না। গরম জলে চান করলে শীত করে? এখানে এসেই আমাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেছ।" দেবী বিরক্ত মুখে বিছানার ওপর জড়ো করা রাজার সকালের ছাড়া জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাজা বুঝতে পারছিল দিদির কেন রাগ হয়েছে। কিন্তু দিদিই বা কেন সকালে বেরিয়ে গেল ? বাবাতো 'ম্যাক্‌ডোনাল্ড' থেকে একবার ফোনও করেছিল। দিদি নাকি তখন দোকানে বসে ঘুমোচ্ছিল। কেউ ডেকে দেয়নি। রাজা আবার দিদির চিৎকার শুনতে পাচ্ছে—"রাজা খেতে এসো।"

অনিল ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। নিজের ছেলে-মেয়েকে এত বছর ছেড়ে থাকার পর সহজ হতে সময় লাগছে। ছেলেটা এখনও ছোট। সারাদিন অনিলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে, খেলনামাত্র পেয়ে খুশি হয়ে দিদিকে বলতে গিয়েছিল। কিন্তু দেবীর প্রতিক্রিয়া

অনিল ভালোই বুঝতে পারছে। আজ বেড়াতে যেতে পারেনি বলে নয়, এ বাড়ির পরিবেশটাই ও মেনে নিতে পারছে না। অথচ অনিল তো গতবছর দেশে গিয়ে দেবীকে স্পষ্ট বলেছিল তোমাদের কিছুদিন স্টেপ-মাদারের সঙ্গে থাকতে হবে। সেও চায় তোমরা আমেরিকায় চলে আসবে। তার একটা ছেলে। সে আলাদা থাকে। তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

এইসব কথা বুঝিয়ে অনিল ওদের এখানে এনেছে। মেহরীনও একরকম মেনে নিয়েছে। কোনো দুর্ব্যবহার তো করছে না। তাহলে দেবী সারাক্ষণ মুখ গম্ভীর করে আছে কেন? এরপর মেহরীন রেগে গেলে অনিল কোন্ দিক সামলাবে?

দেবী কিচেন থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল— "মাইক্রো-ওয়েভটা কী করে চালাব একবার দেখিয়ে দেবে?" অনিল ব্যস্ত হয়ে বলল— "তুই টেবিলে প্লেট দে। আমি খাবার গরম করে দিচ্ছি।"

—"কেন? আমাকে দেখিয়ে দাও না। আমি সব করছি। রাজার জন্যেই তাড়া করছি।"

রাজাকে খেতে দিয়ে দেবী মেহরীনের জন্যে অপেক্ষা করল। মেহরীন ফেরার পর তিনজনে খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে শুতে রাত এগারোটা। পরদিন রবিবারেও মেহরীনের দোকান খোলা। দেবীকে মেহরীন বলল—"কাল সী-বীচে ঘুইরা আসো"। অনিলকে বলল—"ওদের কোনি আইল্যান্ডে নিয়া যান। রাইড্‌গুলি এন্‌জয় করবো।"

অনিল বাসনপত্র ধুতে ধুতে উত্তর দিল—"ওরা কি বেড়াতে এসেছে যে এখনই সব দেখাতে নিয়ে যাব? আগে ওদের জামাকাপড় কেনা দরকার। কাল ওদের নিয়ে মেসীতে যাব ভাবছি।"

—"সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না। ঐ দিন তো আমার ছুটি। আমিও শপিং-এ নিয়া যাইতে পারি।"

কলকাতার কৃত্তিবাস লেনের ভাঙাচোরা বাড়িটার ঠিকানায় আজকাল প্রায়ই বিদেশের চিঠি আসে। এককেদিন ডাকবাক্স খুলে দেবীর চিঠি দেখে প্রতিমা অধীর অপেক্ষা নিয়ে থাকেন। জবা টেলারিং শপ থেকে ফিরে চিঠি খুললে তবে নাতি-নাতনীর খবর পাবেন। দেবীর জন্যে রাজার জন্যে সারাক্ষণ মন কেমন করে। কতরকম চিন্তা হয়। ছেলেমেয়ে দুটো কীসের মধ্যে গিয়ে পড়ল কে জানে ? দুঃখী মানুষটা এখানে পড়ে রইল। ওদিকে বাপেরও তেমনি মতিগতি। বাবা, মা, বউ, কারুর ওপর ওর ভালোবাসা আছে? এতটুকু মায়া-মমতা আছে? শুকনো কর্তব্য ছাড়া কিছু বোঝে? হঠাৎ ছেলেমেয়ে দুটোকে জেদ করে নিয়ে গেল। প্রতিমা আজকাল অনিলের সব কাজের মধ্যেই মতলব খুঁজে পান। নিজের টাকাপয়সার জোর থাকলে কখনো ওদের যেতে দিতেন না। জবাও বা কোন্ ভরসায় বাধা দেবে? দর্জির দোকানে সারাদিন সেলাই করে ঐ তো রোজগার। অনিলের টাকা বন্ধ হয়ে গেলে সংসার অচল হয়ে যাবে। দেবী বড় হয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর একজন পুরুষ মানুষ নেই। সেও এক চিন্তা। দেবীও তো যেতে আপত্তি করল না। ঐ আমেরিকার মোহ। এখানে অভাবের সংসারে স্নেহ-ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু তো তার দেওয়ার সাধ্য ছিল না। অনিল একরকম জোর করে-ই ওদের কেড়ে নিয়ে গেল। অসহায়, নিরুপায় দুটো মানুষের বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না। আজ একবছর হয়ে গেল, এখনও জবা আর পাপুকে নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করছে না। অনিল কি সত্যিই ঐ মুসলমান মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল ? এখনও অনিল ওর সঙ্গে থাকে

কেন? জবাকে জিজ্ঞেস করলে কথাগুলো এড়িয়ে যায়। ওঁদের ওপর জবার রাগ, অভিমান আজও যায়নি। জবার ধারণা, প্রতিমারা ছেলের স্বভাব, চরিত্র জেনেও বিয়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য কথা। অনিল জাহাজে কাজ করত। সারা বছর জলে জলে ঘুরছে। সে কোন দেশে গিয়ে কবে কী করছে, এখানে বসে জানা সম্ভব ছিল? ওঁরা সত্যিই কিছু বুঝতে পারেননি। আজ তার ফল ভুগতে হচ্ছে। জবার দুঃখ অপমান, বঞ্চনার মূলে নিজেকে নিমিত্ত ভেবে বড় কষ্ট হয়। অনিলেরও স্বভাব শোধরাল না। কত বছর ধরে বউটাকে মিথ্যে আশা দিয়ে যাচ্ছে। জবা সবই বোঝে। বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে। তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরই বা যাওয়ার জায়গা কোথায়? প্রতিমার জীবনেও অবলম্বন বলতে ওরাই। দেবী, রাজা চলে যেতে সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। এরপর পাপুকে নিয়ে জবাও যদি চলে যায়, এই সংসার শূন্য হয়ে যাবে। তবু জবার কথা ভেবে, নাতি-নাতনীরা ভালো থাকবে ভেবে প্রতিমা সেই একাকিত্বের কষ্ট সহ্য করে নেবেন। এ বয়সে এত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর নিতে পারেন না।

জবা বাড়ি এসে পাপুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। কদিন ধরে ওর সর্দিজ্বর চলছে। ওষুধপত্র কিনে ওরা বাড়ি ঢোকার মুখে প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। জবার হাতে দেবীর চিঠি আর এক কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে প্রতিমা পাপুকে খাওয়াতে বসালেন। জবা চা শেষ করে শোবার ঘরে গেল। প্রতিমা খানিকক্ষণ ওর সাড়া শব্দ পেলেন না।

উপঝরান্ত বৃষ্টি নেমেছে। রান্নাঘরের সামনে উঠোনের ফুলগাছগুলো জলে ভিজে সারা। দেখতে দেখতে জবার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তার জীবনে কখনো এমন বৃষ্টি নামল না।

অশান্তির আগুনে কবলে কবলে সারাজীবন ঝুড়ে শুধু খরা। আর কতকাল এভাবে কাটবে। আজ দেবীর চিঠি পড়ে বড় দিশাহারা লাগছে। জীবনের জটিল জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা যে কি কঠিন। জবা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে রইল।

প্রতিমা ঘরে এলেন—"কী লিখেছে দেবী? ওদের শরীর টরীর ভালো আছে তো?"

শব্দহীন কিছু মুহূর্ত পার হওয়ার পর জবার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর প্রতিমার কানে বাজল—"রাজা ওখানে থাকতে চাইছে না। চলে আসার জন্য অস্থির হচ্ছে। তবু ওরা পাঠাবে না। পাপু খেতে খেতে উঠে এসেছিল। মার কথা শুনে বলে উঠল—"দাদা ঠিক চলে আসবে দেখো। ওকে তো ইস্কুলে সবাই মারে।"

প্রতিমা ঘুরে তাকালেন "—রাজাকে ইস্কুলে মারে ? সে কি? জবা, রাজা তোমাকে এ কথা বলেছে?"

জবা উত্তর দিল—"না, না, অত কিছু নয়। সেদিন ফোনে বলছিল খেলার সময় একদিন ঝগড়া লেগেছিল। রাজা মার খাচ্ছিল দেখে অন্য ছেলেরা থামিয়েছে। যেটা মেরেছিল, তার বাড়িতে ইস্কুল থেকে ওয়ার্নিং লেটার দিয়েছে। দেবীর কাছেই সব শুনলাম।

—"কি কাণ্ড! রোগা ছেলেটাকে ধরে মারল! আমেরিকান গুলোর গায়ে কম জোর নাকি? তুমি তো আমাকে বলোনি?"

— "বলার কী আছে মা? এখানে থাকলেই কি আগলে রাখতে পারতেন? ছেলেকে ওভাবে মানুষ করা যায় না। আমি ও সব নিয়ে ভাবছি না।"

প্রতিমা মনে মনে ভাবলেন—ছেলেকে মানুষ করার ব্যাপারে তাঁরা যে ব্যর্থ হয়েছেন, সে কথা জবা তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

জানাতে ছাড়ে না। ও কথায় না যাওয়াই ভালো। কিন্তু রাজা ফিরে আসতে চাইছে কেন? জবার মুখখানা ভার ভার। দেবী যে কি লিখেছে, তাও বুঝতে পারছেন না প্রতিমা। জবা পাপুকে বলল— "যা, ঠাকুমার সঙ্গে গিয়ে খেয়ে নে। তারপর ওষুধ দেব।"

প্রতিমা তখনো দাঁড়িয়ে আছেন দেখে জবা বলল— "রাজার আসা হবে না। দেবী লিখেছে— ইংরিজি নিয়ে ওদের দুজনেরই অসুবিধে হচ্ছে। গরমের ছুটিতে আলাদা করে ক্লাস করতে হবে। ইস্কুল থেকেই ব্যবস্থা করেছে। রাজা এই সেপ্টেম্বরে ক্লাস সিক্সে যাবে। দেবী যাবে হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে। তার আগে গরমের ছুটিতে দু মাস মেকাপ কোর্স্ করবে। দুজনের কারুর পক্ষেই এ বছর আসা সম্ভব নয়।"

—"আর আসার দরকার কী? এরপর তো তোমরাই চলে যাবে। তার ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে? নাকি অনিল সেই গড়িমসি করছে?"

পাপুর দিকে একবার তাকিয়ে জবা বলল—"এখন শুনছি বছর দুই-এর আগে আমাদের স্পনসর করতে পারবে না। প্লেনভাড়া, নতুন সাংসারের খরচ, এত কিছু এখন দিতে পারবে না। দেবীকে এ সব কথা বুঝিয়েছে। দেবী আশা করেছিল আমরা এ বছরে চলে যাব। বাবার কথায় মন-মেজাজ ভালো নেই। চিঠিতে সে সব লিখেছে। কাল কাজে যাওয়ার পথে একবার ফোন করব।"

নিউইয়র্কে রাত প্রায় আটটা। দেবী হোমওয়ার্ক শেষ করে জামাকাপড় ইস্ত্রি করছিল। রাজা অনিলের সঙ্গে কমপিউটারে বসেছে। মেহরীনের জ্বর। দোকান থেকে তাড়াতাড়ি চলে

এসেছিল। রাতে ভাত খেল না। দুধ সিরিয়াল খেয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদের শোবার ঘর অন্ধকার।

বসার ঘরে ফোন বাজল। অনিল ধরেছে। দেবী ওর ঘর থেকে রাজার গলা শুনতে পাচ্ছিল। নিশ্চয়ই মার ফোন। মা মাঝে মাঝে ফোন বুথ থেকে অল্পক্ষণের জন্যে কথা বলে। দেবী ইস্ত্রি বন্ধ করে বসার ঘরে গেল। রাজা তখন মাকে ওর জন্মদিনের খবর দিচ্ছিল। দেবী হাত বাড়াল—"অ্যাই, এবার আমাকে দে। মার কত বিল উঠছে না?"

দেবী কর্ডলেস হাতে অনিলের দিকে তাকাল—"তোমার কি কথা বলা হয়ে গেছে?"

অনিল কমপিউটারের স্ক্রিনের দিকে চেয়ে উত্তর দিল—

—"হ্যাঁ। ব্যাংক ড্রাফট পেয়ে গেছে।" দেবী ফোন নিয়ে নিজের ঘরে গেল। যা প্রাণ চায় মাকে বলুক। অনিল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটা বুঝে গেছে, দেবী এদেশেই থাকতে চায়। রাজাকেও বুঝিয়ে-শুনিয়ে রেখেছে। শুধু জবা আর পাপুকে আনানোর জন্যে অনিলকে উদব্যস্ত করে তুলছিল। অনিল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে দেড়/ দু বছরের আগে ওদের আনতে পারবে না। শুনে দেবী গুম মেরে রইল। মেহরীনের কাছে কি বলেছে কে জানে ? তারও কি সহানুভূতি! আশ্চর্য। মেহরীন কী অনিলের পরিস্থিতি জানে না? নাকি নিজে থেকে একটা বোঝাপড়া করতে চাইছে। কেন? জবাকে দয়া দেখানোর জন্যে তাহলে এত বছরের সম্পর্কের কোনো দাম নেই? ইদানীং কেমন আল্‌গা আল্‌গা ব্যবহার করছে। অনিল আজও যেন মেহরীনকে বুঝে উঠতে পারল না।

ভোরবেলা মেহরীনের ঘুম ভেঙে গেল। মাথা ভার, গলায় ছুঁচ ফোটার মতো চিন্‌চিনে ব্যথা। নাইটির ওপর দিকটা ঘামে ভিজে গেছে। খানিক এপাশ ওপাশ করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। দু/তিন দিন ধরে জ্বর হচ্ছিল। এটা ওটা ওষুধ খেয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। কাল থেকে একদম কাহিল অবস্থা। আজ আর দোকানে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। ক্লান্ত শরীরে মেহরীন রান্নঘরে চা করতে ঢুকল। তখনই চোখে পড়ল বারান্দার কাচের দরজাটা খোলা। ফুলগাছের ছোট ছোট টবের পাশে দেবী টুল পেতে বসে আছে। —

"এত সকালে উইঠা পড়ছো? আজ তো স্কুল নাই?"

—"না, আজ ছুটি। কাল থেকে সামার স্কুল। আপনি কেমন আছেন? এখনও জ্বর আছে?"

— "আছে বোধ হয়। একটু রেস্ট দরকার। আজ আর স্টোরে যাব না।"

অনিল ম্যানহাটনে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করে। সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে গেল। দেবী খানিকক্ষণ রাজাকে পড়াল। কাল থেকে রাজারও সামার স্কুল আরম্ভ হবে। দেবী ওকে একটা ইংরিজি বই পড়তে দিয়ে বলে গেল— "সারাক্ষণ টিভি দেখবি না।"

দুপুরে পল্‌-এর মা এসে তোদের পার্কে নিয়ে যাবে।"

— "তুই যাবি না?"

— "না। মেহরীন আন্টির জ্বর। আমি আজকে ডিনার বানাব। তুই বইটা পড়ছিস না কেন? স্টোরিটা কিন্তু পুরো শুনতে চাইব। নয়তো, পার্কে যেতে দেব না।"

দেবীর সামনে রাজা বই খুলে বসল। খানিকবাদে মেহরীনকে জিজ্ঞেস করে টিভি চালাল। দেবী মেহরীনের সঙ্গে ওদের শোবার ঘরে বসে কথা বলছিল। সারাদিনের পরে অল্প সময়ের জন্যে দুজনের দেখা হয়। আলাদা করে কোনো কথাই হয় না। ছুটির দিনেও তাই। সোমবার মেহরীন বাড়ি থাকে। দেবী বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখো মেহরীন সারা সপ্তাহের রান্নাবান্না সেরে রাখছে। গাদা গাদা মাছ ভাজছে। চিকেন, গোটমিটের ঝোল বানাচ্ছে। দেবীও সাহায্য করে। কাজের ফাঁকে গল্প চলতে থাকে। মেহরীন ওদের পড়াশোনার খবর নেয়। কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে দেবী তার নিজের কোনো কথা বলার সুযোগ পায় না। অথচ তার মনে অনেক প্রশ্ন জমে আছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। ইচ্ছেও করে না। দেবী বোঝে ওর মাকে এ বাড়িতে কেউ চায় না। অজানা আশঙ্কায় দেবীর বুক কেঁপে ওঠে। তাহলে কি মাকে এরা কোনোদিন আমেরিকায় আনবে না? পাপুও বা কী করে আসবে? মার জন্যে, ছোট্ট বোনটার জন্যে সারাক্ষণ মন কেমন করে। মা আর কত কষ্ট করবে। টেলারিং-শপ থেকে ফেরার পথে বাজার করে আনত। গরমের মধ্যে ঘুপচি রান্নাঘরে বসে রান্না করে ওদের খেতে দিত। তখন দেবী একটা রুটি বেলে দিয়েও সাহায্য করেনি। আজ ভাবলে এত কান্না পায়। দেবী ভাবে মেহরীন আন্টিকে কয়েকটা কথা বলবে। মেয়েদের মন অনেক রকম হয়। যদি মেহরীন আন্টি বাবাকে একটু বোঝাতে পারে।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে মেহরীন একটা ম্যাগাজিন দেখছিল। দেবী একটু ইতস্তভাবে কথা শুরু করল—

— "আন্টি, কাল আমার মা ফোন করেছিল।

আপনি তখন শুয়ে পড়েছেন।”

মেহরীন চশমার কাচের ভেতর দিয়ে চেয়ে আছে। কোনো কথা বলছে না। দেবীর ভয় হল। মেহরীন আন্টি কি প্রসঙ্গটা পছন্দ করছে না? বিরক্ত হচ্ছে? কিন্তু দেবী তো শুধু মার ফোনের কথা বলেছে। এতেও যদি মেহেরীন আন্টি রেগে যায়, তবে আর বাকি কথাগুলো বলবে কী করে?

দেবী প্রশ্ন করার সাহস হারিয়ে ফেলছিল।

—“কী কথা হল মায়ের সাথে? উনারা ভালো আছেন? তোমার বাবার ব্যাংক ড্রাফট পৌঁছায় নাই?”

দেবী মাথা নাড়ল— “ড্রাফট পেয়ে গেছে। মা সেজন্য ফোন্ করেনি। আমার বোনের খুব জ্বর। মা একা একা আর পারছে না। আমরাও চলে এলাম। আন্টি, মার জন্যে এত কষ্ট হয় ...”।

দেবী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। রাজার সামনে নিজেকে শক্ত রাখে। বাবার মেজাজ দেখে মার কথা তুলতে ভয় পায়। দেড় বছর ধরে ঘরে-বাইরে অচেনা পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। শুধু একটাই আশা। এবার মা আসবে। কিন্তু সেখানেও যেন সন্দেহ জাগছে। দেবী কান্নাজড়ানো গলায় বলছিল—“আন্টি, মা আর পাপুর প্লেনভাড়া কি অনেক বেশি? আপনিও দিতে পারবেন না?”

মেহরীন দেবীর পিঠে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে রইল। বিদেশ বিভুঁই-এ ছোট একটা মেয়ে ভেতরে ভেতরে কত দুঃখ চেপে রেখেছে। অনিল ওদের যাই বোঝাক, মেহরীন কিছুতেই মিথ্যে কথাগুলো মেনে নিতে পারে না। অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। অথচ দেবী আজ ওর কাছেই সাহায্য চাইছে। মেহরীন ওকে

কীভাবে বোঝাবে ? চোদ্দ বছর বয়সে এদেশের মেয়েরা জীবন সম্পর্কে যতখানি জানে, বোঝে, দেবীকে ঠিক সেরকম মনে হয় না। তবু ওর সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সময় হয়েছে। মিথ্যে আশা দিয়ে অনিল আর কতদিন ভুলিয়ে রাখবে? অশান্তি হয় হোক, মেহরীন আজ দেবীকে সত্যি কথা বলবে।

দেবীকে দু/এক কথায় শান্ত করে মেহরীন ওদের সঙ্গে ল্যাঞ্চ সেরে নিল। জ্বরের মুখে সবই বিস্বাদ লাগছে। যাহোক করে খাওয়া শেষ করল। দুপুরে সামনের বাড়ির পল্ আর ওর মা ড্যানিয়েল এসে রাজাকে পার্কে নিয়ে গেল। এ পাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে রাজা বেশ মিশে গেছে। রোজই তার নতুন নতুন বন্ধু হচ্ছে। আজ ড্যানিয়েল ওকে ডিনার খাইয়ে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

মেহরীনের শরীরটা ভালো লাগছিল না। আবার বোধহয় জ্বর আসছে। একটু শুয়ে থাকতে পারত। কিন্তু দেবীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওষুধপত্র খেয়ে নিয়ে দেবীকে নিজের ঘরে ডাকল।

বাইরে চড়া রোদ। আধো অন্ধকার ঘরে এয়ারকন্ডিশনারের মৃদু যান্ত্রিক শব্দ শুনতে শুনতে দেবীর মনে হল মেহরীন আন্টি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ছেন। মেহরীন বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছিল। হয়ত নিজেকে প্রস্তুত করছিল। দেবী যখন উঠে আসবে ভাবছে, মেহরীন জিজ্ঞেস করল—"তোমার মায়ের আমেরিকায় আসার ব্যাপারে বাবা কী বলেন?"

—"আগে বলেছিলেন বেশি দেরী হবে না। এখন বলছেন দু বছর লাগবে। বেশি জিজ্ঞেস করলে রেগে যান। আন্টি, সত্যি কি মার আসতে দু বছর লেগে যাবে?"

—"দেবী, তুমি প্লেন ভাড়ার কথা বলছিলে। সেইটা কিন্তু আসল কথা নয়। প্রবলেমটা অন্যখানে। তোমার মা ট্যুরিস্ট ভিসায় বেড়াইতে আসতে পারেন। কিন্তু পার্মানেন্ট ভিসা পাইবেন না।"

দেবী অবাক—"কেন? আমরা যে চলে এলাম। বাবা স্পনসর করলে মা আর পাপুও গ্রিনকার্ড পেয়ে যাবে।" দেবীর সহজ উত্তর শুনে মেহরীনের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সামান্য নীরবতার পরে বলল—" তুমি আর রাজা ওর ছেলেমেয়ে। তাই গ্রিনকার্ড পাইয়া গেছ। কিন্তু তোমার মাকে উনি ওয়াইফ হিসাবে স্পন্‌সর করতে পারবেন না। লিগ্যাল প্রবলেম আছে।"

দেবী হতবাক। বাবা কেন মাকে স্পনসর করতে পারবে না?

লিগ্যাল প্রবলেমটাই বা কী? ওরা চলে এল। অথচ মার বেলাতেই আমেরিকা ভিসা দেবে না? মেহরীনের কথাগুলো ও ঠিক বুঝতে পারছিল না।

মেহরীনের খুব খারাপ লাগছিল। অনিল যা কোনোদিন তার দেশের ফ্যামিলিকে জানায়নি, আজ মেহরীনকে তাই বলতে হচ্ছে। দেবীর মুখ দেখে মায়া হচ্ছিল। তবু ঘটনাটা ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে। মেহরীন আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল— "দেবী, তুমি বড় হয়েছ। হয়তো অনেক কিছু বুঝতে পারো। আমেরিকায় আমি তোমার বাবার লিগ্যাল ওয়াইফ। দশ বৎসর আগে আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হইছে। এখন তাঁর পক্ষে ইন্ডিয়াতে কাউকে ওয়াইফ হিসাবে স্পনসর করা সম্ভব নয়। তোমার মায়ের তো সেই লিগ্যাল স্টেটাস নাই।" দেবীর বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাবা মেহরীনের সঙ্গে থাকে বলে আসল বিয়েটা মিথ্যে হয়ে যাবে? মার সঙ্গে বাবার আর কোনো সম্পর্ক নেই ? তাহলে বাবা কলকাতার বাড়িতে যায় কেন? মাকে টাকা পাঠায় কেন?

দেবী প্রতিবাদ করে উঠল—"আপনি যা বলছেন, বাবা কিন্তু কোনোদিন তা বলেনি। বাবা এখানে থাকলেও মার সঙ্গে রিলেশন তো রেখেছে। মা তো এসব কথা ভাবতেও পারবে না।" মেহরীন দেবীর উত্তেজনা লক্ষ করছিল। এরকম যে হবে, জানত। ও শান্তভাবে উত্তর দিল— "প্রথম বিয়েটা তোমার বাবা ভেঙে দিয়েছিলেন। দশ বৎসর আগে এখানে রেজিস্ট্রি করার সময় নিজেকে ডিভোর্সড বলেছিলেন। তখনো কিন্তু ম্যারেডই ছিলেন। পরে ইন্ডিয়ায় যাইয়া তোমার মায়েরে দিয়া পুরানো ডেট্-এ ডিভোর্সের পেপার সই করাইয়া আনলেন। এ গুলি তোমার জানার কথা নয় দেবী। তোমার মাও কতদূর কী জানেন বলতে পারি না।" ঘরের ভেতর তাপহীন নিঝুম দুপুর। দেবী কখন উঠে চলে গেছে। মেহরীন বলেছিল—"চাইলে তোমার মায়েরে কল্ করতে পারো। মনের কষ্টের কথা এদেশে শোনার কেউ নাই। নিজের জীবন দিয়া বুঝছি।"

দেবী দরজার ওপার থেকে বলে গেল—"এখন ওখানে অনেক রাত। আমাদের বাড়িতে ফোনও নেই।"

পাড়ায় কোথাও আগুন লেগেছে। দূর থেকে ফায়ার ট্রাকের হর্ন, পুলিশের গাড়ির সাইরেনের তীব্র আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছে। মেহরীনের শরীর, মন অবসন্ন। মাথার ভেতর দেবীর কথাটা ভাঙা রেকর্ডের মতো বেজে চলেছে। বাবা এখানে থাকলেও মার সঙ্গে রিলেশন তো আছে। রিলেশন বলতে কীসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল দেবী? ওর ছোট বোনের জন্মের কথাটা বোঝাতে চাইছিল? আমেরিকায় বড় হলে দেবী সেটা মুখের ওপর বলতেও দ্বিধা করত না। অনিল মেহরীনকে বিয়ে করার চার বছর বাদে দেবীর ঐ বোনটা হয়েছে। যত অবহেলাই করুক,

আগের সংসার তো অনিল ছাড়ল না। বউকে বলার সাহস হল না, আমি আর তোমার স্বামী নই। সে সম্পর্ক কাগজে-কলমে চুকিয়ে দিয়েছি। আজ মেহরীন দেবীকে সেটাই জানিয়ে দিল। তার জন্যে বাড়িতে অশান্তি হয় তো হোক। তবু, মেয়ের সঙ্গে বাবার বোঝাপড়া হয়ে যাক। দেবীকে যত নরম সরম মনে হয়েছিল, তা নয়। মায়ের জন্যে যেভাবে রুখে দাঁড়ানো। কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অনিল হয়তো ওকে দেশেই পাঠিয়ে দেবে। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে মেহরীনের মন খারাপ লাগছিল। দেবীর কতই বা বয়স। তবু কীভাবে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে শিখে গেল। মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। লোভ নেই, প্রত্যাশা নেই, অযথা কৌতূহল নেই। মেয়েটার এত গুণ, তবু অনিল ওকে বেশ শাসনে রাখতে চেষ্টা করে। আজকের ঘটনার জের কোথায় পৌঁছোবে কে জানে ? মেহরীন ভেতরে ভেতরে উৎকণ্ঠা বোধ করছিল।

সন্ধের আগে রাজা ফিরে এল। বিকেলে কমিউনিটি পুলে সাঁতার কেটে পলের বাড়িতে ডিনার খেয়েছে। কাল থেকে সামার স্কুল। বাড়ির কাছাকাছি একটা মুভি থিয়েটার আছে। দেবী আজ ওকে মুভি দেখতে নিয়ে যাবে বলেছিল। কিন্তু রাজা বাড়ি এসে দেখল দিদির মুড খুব খারাপ। ঘরে দরজা বন্ধ করে বসেছিল। রাজা ঢুকতেই রাগ রাগ গলায় জিজ্ঞেস করল— "বাবা ফিরেছে?"

—"এখনও আসেনি।"

—"এলে আমাকে ডাকবি না। খেতেও ডাকবি না।" দেবীর স্বর কান্নায় বুজে আসছিল। রাজার মনে হল দিদি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। কিন্তু ও তো সহজে কাঁদে না। শুধু বাবা যেদিন বলল মা

আর পাপুকে এখন আনবে না, সেদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে রাজা দিদির চোখে জল দেখেছিল। আজ আবার কী হল? মেহরীন আন্টি কি মুভি দেখতে যেতে দেবে না বলেছে?

প্রশ্নটা করতে গিয়ে রাজা দেবীর কাছে ধমক খেল—"সারাদিন শুধু হুজুগ। খুব মজায় আছিস না? যা, আমাকে ডিসটার্ব করবি না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি বডি টু কাম......" রাজা থতমত খেয়ে দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে এল।

অনিল বাড়ি আসার পর মেহরীন যে অশান্তির ভয় পাচ্ছিল দেবীর ব্যবহারে তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না। সে নিজে থেকে খাবার টেবিলে এসে বসল। মেহরীন আজ রান্না করে উঠতে পারেনি। পাড়ার চীনে দোকান থেকে রাতের খাবার ডেলিভারি দিয়ে গেছে। রাজা আবার লোভে লোভে খেতে বসল। দেবী থমথমে মুখে খাবার নাড়া চাড়া করছিল। অনিল জিজ্ঞেস করল—ঠিক করে খাচ্ছিস না কেন? চাইনিজ ভালো লাগল না?" দেবী উত্তর দিল না। প্লেট, কাঁটাচামচ তুলে নিয়ে রান্নঘরে চলে গেল।

অনিলের রাগ হচ্ছিল। মেয়েটা এত জেদি কেন? আজকাল কথায় কথায় মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। একটা কথার উত্তর দিতে কী হয়? অনিল হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল—

"দেবী এদিকে আয়, কী হলটা কী?" মেহরীন বাধা দিল—"থাক না। হয়ত শরীর ঠিক নাই। জোর কইরেন না। কাল সকালে স্কুল আছে।" রাজা ভয়ে ভয়ে খবর দিল— "দিদি বলছিল কলকাতায় চলে যাবে। পরে বলল নেক্সট ইয়ারে যাবে। আজ লর্ড অফ্ দ্য রিং দেখব ভেবেছিলাম। রাগ করে নিয়ে গেল না।"

অনিল মেহরীনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল— "তুমি আজ বাড়িতে ছিলে তো। কখন থেকে রাগারাগিটা হল?" মেহরীন রুক্ষ গলায় জবাব দিল—"আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের কোনো ঝগড়া নাই। কার ওপর অভিমান কইরা আছে, নিজে বুঝেন না? সামান্য কারণে মাথা গরম করেন! মেয়েটার মন বোঝার চেষ্টা করেন। বয়সটা ভালো নয়।"

মেহরীন আর কথা বাড়াতে দিল না। খাওয়ার পরে রাজাকে শুতে পাঠিয়ে দিল। রাজ দশটা নাগাদ টিভির খবর শুনতে শুনতে অনিল টের পেল মেহরীন দেবীর ঘরে ঢুকেছে। একটু পরে দুজনে কিচেনে গেল। ফ্রিজ বন্ধ করার শব্দ, মাইক্রোওয়েভের আওয়াজ, তার মানে দেবীর জন্যে আবার চীনে খাবার গরম হচ্ছে। অনিল আর আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাবে না। মেহরীন লেকচার মেরে গেল মেয়েটার মন বোঝার চেষ্টা করেন। দেবীর মন কী চাইছে, অনিল কি তা বোঝে না। সত্যি যদি এখনই জবাকে এনে হাজির করে, মেহরীন সহ্য করবে? শুধু থিয়েটারের ডায়ালগ ঝেড়ে যাচ্ছে। ছেলের কাছে শিখছে বোধহয়। সে তো আবার নট্যকার। ভাগ্যিস অনিল চাপ দিয়ে সোহেলকে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ড্রামা পড়তে দেয়নি। তখন সায়েন্স পড়েছিল বলে পাস করে পাওয়ার কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে গেল। মেহরীন অন্তত এ কথাটা স্বীকার করে।

টিভির রিমোট, ঘরের আলো পটাপট নিভিয়ে দিতে দিতে মেহরীন প্রায় হুকুমের গলায় বলল—আর নয়। অনেক রাত হইছে। শুইতে আসেন। কাল আমারে তাড়াতাড়ি দোকানে যাইতে হবে। ফারুক যে কী করতেসে, আজ মাল ডেলিভারি হয় নাই।"

অনিল হাই তুলে বলল— "বামুন গেল ঘর, তো লাঙল তুলে ধর। তুমিও তো এখন বামুন। মেহরীন চক্কোত্তি?"

মেহরীন হেসে ফেলল—"আমার নিজেরই খেয়াল থাকে না। আপনার পদবিটা আমার প্রয়োজনও ছিল না। এখনও যে সেই আজম লিখি।"

মেহরীন কি অনিলকে বিদ্রূপ করে গেল? অনিলের পরিচয়ে ও এদেশে আসেনি। ঢাকা থেকে আসিফ আজমের বউ হয়ে এসেছিল। এখন ও সেই পরিচয়টাই ধরে রেখেছে। আর, ঐ প্রয়োজনের কথাটা ইচ্ছে করে বলে গেল। অনিলকে অপমান করার জন্যে ঐ একটা কথাই অনেক। অনিলের কান, মাথা গরম হয়ে উঠছিল। নেহাত ছেলেমেয়ে দুটো বাড়িতে আছে। নয়ত অনিলও চুপ করে থাকত না। আর, এখন তো ওরা যেন মেহরীনেরই দলের লোক। "অন্ধকারে ভূতের মতো বইসা আছেন। এত রাগ কীসের? ঘরে চলেন।"

রাত ঘন হয়েছে। জানলার ব্লাইণ্ডস্ এর ফাঁকে স্ট্রিট লাইটের অস্পষ্ট আলোর উকিঝুঁকি। একরাশ খোলা চুলে শ্যাম্পুর মৃদু গন্ধ নিয়ে মেহরীন কাছে এসেছে। শরীর ঘিরে আলো-আঁধারির মায়া। অনিল মুহূর্তের মধ্যে ওকে কাছে টেনে আনল। আহত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল—"বারবার শুধু আমার প্রয়োজনের কথাটা বলো। সেদিন তোমার কোনো প্রয়োজন ছিল না? সোহেলের তখন তেরো বছর বয়স। আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করিনি?"

অনিলের উত্তেজনা মেহরীনকে স্পর্শ করল। দেবীর ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছিল।

অনিলের বুকে হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল—"আমি তো কেবল আপনার পদবি নিয়া রসিকতা করছিলাম।

সেদিনের প্রয়োজনের কথা যদি বলেন, তখন কিন্তু আমার চাইতে আপনার তাগিদই বেশি ছিল। আজ আর তা বুঝি না...।"

— "সব সময় এই এক কথা! আর কী চাও তুমি?" অনিলের উদ্ধত ভঙ্গি দেখে মেহরীন থমকে দাঁড়াল। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে— "আমি চাই আপনি ছেলেমেয়েকে সত্য কথা বলেন। কেন তাদের মায়েরে ডিভোর্স করছিলেন, সে কথা ওদেরও জানা দরকার।"

অনিলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মেহরীন ঘর ছেড়ে চলে গেছে। দেবীর ঘরে দরজা খোলার শব্দ হল। দেবী, রাজা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

আপাতদৃষ্টিতে একদিনের অশান্তির ঢেউ এক সপ্তাহেই মিলিয়ে গেল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চারজনের বাঁধাধরা রুটিন। স্কুল ছুটির পরে রাজা আর দেবী অনেকক্ষণ বাড়িতে থাকে। অনিল ফেরে প্রায় সাতটায়। মেহরীন সারাদিন জ্যাকসন হাইট্স্ এর দোকানে। ঐ রাতের ঝগড়ার পর অনিল বেশ সতর্ক হয়ে আছে। মেহরীনের সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছে। দেবী কিন্তু ওর কাছে কিছু জানতে চায়নি। সে একরকম সোয়াস্তি। ওর মাকে চিঠিতে জানিয়েছে কিনা কে জানে? এমনিতে অনিল দরকারি কথা ছাড়া জবার সঙ্গে ফোনে বেশি কথাবার্তা বাড়ায় না। মাসে দু/একবার ওদের পাশের বাড়িতে ফোন করলে জবাকে ডেকে দেয়। অন্য সময় জবা ফোনবুথ থেকে ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে। অনিলের সঙ্গে জবার সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন জবা বিচ্ছিন্ন জীবনে অভ্যস্ত। তবু ডিভোর্সের

খবর পেলে কী ঘটবে বলা যায় না। হয়তো ছেলেমেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে বলবে। ওরা যেতে না চাইলে অবশ্য জবা কিছু করতে পারবে না। আইনের ব্যাপার-স্যাপারগুলো অনিল অনেক আগেই জেনে নিয়েছে। তাও, অশান্তি এড়াতে পারলে ভালো।

মেহরীন ভেবেছিল দেবী এবার সাহস পেয়ে বাবার কাছে পুরোনো ঘটনা জানতে চাইবে। মেয়েটা বোধ হয় ভয় পাচ্ছে। নিজের ভবিষ্যৎ, রাজার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপস করে নিচ্ছে। ওদের জীবন যে বদলে গেছে, সে তো সত্যি। এ বাড়িতে মা না থাক, সচ্ছলতা আছে। নিরাপত্তা আছে। দেবী হাইস্কুল পাস করে আমেরিকার কলেজে পড়বে। গান শিখছে। সাঁতার শিখেছে। এরপর ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে। গাড়ি চালাবে। এদেশে থাকতে গেলে নিজেকে তো তৈরি করা দরকার। ওরা সে সুযোগও পাচ্ছে। দেবী হয়ত ভাবছে, এর মধ্যে ওর মাকে আনার জন্যে জেদ ধরলে আবার অশান্তি হবে। দেবী একদিন মেহরীনকে বলেও ছিল—আগে তো জানতাম না মার ভিসার প্রবলেম হবে। তাই আপনাকে প্লেন ভাড়ার জন্যে বলেছিলাম। এখনও বুঝতে পারছি না বাবা মাকে ডিভোর্স করল কবে? মা তো কোর্টেও যায়নি।

মেহরীন যে প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে ইতস্তত করেছিল, একদিন সোহেলের কাছে দেবী তার উত্তর পেল। সোহেল নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে থাকে। পাওয়ার কোম্পানির নতুন চাকরি আর নাটকের দলে ঢুকে তার সময়ের খুব টানাটানি। এ বাড়িতে কমই আসে। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে দেখা করতে জ্যাকসন

হাইটস্ এর দোকানে এসে হাজির হয়। এরকম এক শনিবারের দুপুরে কবুতর হালাল মিট, গ্রোসারি স্টোরে সোহেলের সঙ্গে দেবীর প্রথম দেখা হয়েছিল। দেবী মেহরীনের শোবার ঘরের টেবিলে সোহেলের ছবি দেখেছিল। সামনে দেখে মনে হল, সোহেল ছবির চেয়ে বেশি সুন্দর। মেহরীন আন্টির সঙ্গে মুখটা মেলে। কি লম্বা! দেবীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই ঠাট্টা শুরু করল—"উইক্ এন্ডে এটা তোমার বেড়ানোর জায়গা? মা লইট্যা শুট্‌কি সেল্ করতে বসিয়ে দিয়েছে?"

মেহরীন হেসে উঠল—"ফাইজল্যামি করস্ না। দেবী তো গানের স্কুল ফেরত এখানে আসছে।"

সোহেল উৎসাহ দেখাল—গানের স্কুল? ভালো গান করো নাকি?"

দেবী লজ্জা পাচ্ছিল—"না, না। মেহরীন আন্টি ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। জাস্ট কয়েক মাস হল শিখছি।"

সেদিন মেহরীনের কথায় সোহেল দেবীকে বাইরে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িতে রোজ মাছ-মাংস খাওয়া। দেবীর মাঝে মাঝে দোসা খেতে ইচ্ছে করে। একা একা আর কোথায় খেতে যাবে। সোহেল যখন রেস্টোরেন্টের কথা জিজ্ঞেস করল, দেবী বলেছিল—

— "আপনি সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার লাইক করেন? তাহলে উডুপীতে যেতে পারি।"

— "সেই জয়কিশন হাইটস্ এর দোসা আর বড়া? নাকি ম্যানহ্যাটনে যাবে? লাঞ্চের পরে আমার সঙ্গে ব্লীকার স্ট্রিটে নাটকের রিহার্সালেও যেতে পারো।"

দেবী মাথা নাড়ল— "আজ বেশি সময় নেই। এখানে কোথাও চলুন।"

উডুপীতে বসে দোসা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। সোহেলের বাংলা উচ্চারণে ওর মার মতো কোনো বাঙাল টান নেই। সারাক্ষণ ইংরিজি ও বলে না। অনেকদিন পরে দেবী কারুর সঙ্গে একটানা বাংলা বলার স্বাধীনতা উপভোগ করছিল। সোহেল জানতে চেয়েছিল আমেরিকায় দেবীর কেমন লাগছে। স্কুলে বন্ধু হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করায় দেবী ন্যান্সী, কার্লিন আর প্যাট্রিজার কথা বলেছিল। সোহেল একবার কলকাতার খবর জিজ্ঞেস করল। দেবী প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিল। কী লাভ? নিজের বাবাই ওদের মনের কষ্ট বুঝছে না। বাইরের লোককে জানিয়ে কী হবে? মার পক্ষে ব্যাপারটা এত অপমানের যে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতেও ইচ্ছে করে না। দেবী বলেছিল— "কলকাতার জন্য মন কেমন করবে না? আমি তো আপনার মতো এদেশে বড় হইনি। ওখানে আমার কত বন্ধু ছিল। এখনো কয়েকজনকে চিঠি লিখি। মুশকিল হচ্ছে কারুর ই-মেইল অ্যাড্রেস নেই।"

সোহেল কফির কাপ নামিয়ে রাখল—"আমার ই-মেইল্ অ্যাড্রেসটা রেখে দাও। কোনো দরকার হলে কনট্যাক্ট কোরো। চলো, ওঠা যাক্। সময় মতো রিহার্সালে পৌঁছোতে হবে।"

—"কী থিয়েটার করছেন আপনারা?"

—"পাঞ্চিং অ্যাট দ্য সান। পাকিস্তানি ইমিগ্র্যান্ট ফ্যামিলির স্টোরি। আমাদের জেনারেশনেরই একটা সেকশন কীভাবে বড় হচ্ছে, তাদের হার্ডশিপ, সোশ্যাল আইডেনটিটি ক্রাইসিস, ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে লেখা।"

দেবী যে খুব মন দিয়ে শুনছিল তা নয়। এটুকু বুঝতে পারছিল, সোহেল বেশ ব্যস্ত লোক। তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে উঠে পড়ল। দেবীকে সাব-ওয়ে স্টেশনের সিঁড়ির মুখে হাত নেড়ে সোহেল নীচে নেমে গিয়েছিল। দেবী একটু দাঁড়িয়ে থেকে দোকানের দিকে হাঁটতে লাগল। সোহেল ওকে আপনি বলতে বারণ করেছে। নাম ধরে ডাকতে বলেছে। সোহেল ওর চেয়ে অনেক বড়। দেবী কি নাম ধরে ডাকবে? নাকি সোহেলভাই বলবে? বাংলাদেশি আর গুজরাটিরা খুব ভাই ভাই করে। কিন্তু ও হঠাৎ সোহেলভাই ডাকতে যাবে কেন? সম্পর্কটাই বা কী? সোহেল কি ওর স্টেপ-ব্রাদার? ওদের দুজনের বাবা কিংবা মা, কেউ তো এক নয়। দেবীর হঠাৎ হাসি পেল। কলকাতায় থাকতে "সৎভাই" নামে একটা বোকা বোকা বাংলা সিনেমা দেখেছিল। সোহেল মোটেই ওর সৎভাই নয়। দাদা, ভাই, কেউ নয়। পথে যেতে যেতে দেবী নিঃশব্দে উচ্চারণ করল—সোহেল, সোহেল.... ।

বছর ঘুরে গেল। আবার শীতকাল। ক্রিসমাসে কদিনের ছুটি। পরপর দুদিন বরফ পড়ল। টিভিতে শহরতলির যা অবস্থা দেখাচ্ছিল, কুইন্স এর রাস্তাঘাটে অতক্ষণ বরফ জমে থাকল না। রাজারও আর বরফ নিয়ে খেলার বয়স নেই। একদিন বিকেলে দেবী আর রাজা রকিফেলার সেন্টারে আইসস্কেটিং রিং-কে গেল। রাজা দু হাত ডানার মতো ছড়িয়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে স্কেটিং করছিল। ওর বেশ প্র্যাকটিস আছে। দেবী পায়ের চাকা উল্টে দুবার বরফে আছাড় খেল। তারপর হাত-পা ভাঙলেই হয়েছে। রাজাকে তাড়া দিয়ে খানিকক্ষণ বাদে দুজনে রাস্তায় উঠে এল।

কন্‌কনে হাওয়ায় প্রচন্ড শীত ধরে গেছে। ভেন্ডারের খাড়ি থেকে প্রেট্‌জেলে ধোঁয়াটে গন্ধ ভেসে আসছে। ওপারে দাঁড়ানো চশমা-পরা মোটা। স্যান্টাক্লজ। সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে।

দেবী চলমান জনস্রোত দেখছিল। কত ছেলে মেয়ে দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। দেবীর কোনো দল নেই। স্কুলের দু/তিনটে বন্ধু ক্রিসমাস নিয়ে ব্যস্ত। রোজ রোজ মার সঙ্গে শপিং এ যাচ্ছে। আত্মীয়দের বাড়ি নেমন্তন্নে যাচ্ছে। ন্যান্সিরা রেডিও সিটি মিউজিক হলে শো দেখে এল। দেবীর কোথাও যাওয়ার নেই। চার্চের ঘণ্টার শব্দ, স্কেটিং রিংকের বাজনার গমগমে আওয়াজ ছাপিয়ে ওর কানে এল—"দুটো ক্রিসমাস চলে গেল। মা এখনও আসতে পারল না। তোর কি মনে হয়, নেস্কট্‌স্‌ সামারেও আমাদের ইন্ডিয়া যাওয়া হবে না?" দেবী উত্তর দিল—"বাবা এখন তো হ্যাঁ বলছে। দ্যাখ্‌, শেষপর্যন্ত কী করে। না হলে, মেহরীন আন্টি আর সোহেল আমাদের দুজনের প্লেন-ফেয়ার দেবে বলেছে। কে জানে? ওরা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে পারবে নাকি?"

দেবী রাজার জ্যাকেটের কোনা ধরে হাঁটছিল। সন্ধে হয়ে গেছে। মাথার ওপর বরফের ঝিরঝিরে বৃষ্টি। দেবী প্রেট্‌জেল খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—"সেন্ট প্যাট্রিক্‌স্‌ চার্চে যাবি? কোনোদিন তো ভেতরে যাইনি।"

রাজা রাজি হল না। ওরা সাব-ওয়ে নিয়ে কুইনস্‌ এ ফিরে গেল। বাড়ির দরজায় পোঁছে দেবী যেন চেনা গলার আওয়াজ শুনল। বেল্‌ বাজাতে দরজা খুলে দিল সোহেল। লাল সোয়েটার পরলে ফর্সা ছেলেদের খুব হ্যান্ডসাম লাগে। দেবীর মনে হল

ভাগ্যিস আজ ওরা চার্চে গিয়ে বসেনি। তাহলে হয়তো সোহেলের সঙ্গে দেখা হত না। সারাদিনের একঘেয়েমি, একাকিত্বের পরে এমন কেউ বাড়িতে এসেছে, যাকে দেখলে দেবীর মন ভালো হয়ে যায়। আজ সোহেল কি অনেকক্ষণ থাকবে?

টেবিলে কয়েকটা ক্রিসমাসের উপহারের বাক্স। অনিল গম্ভীর মুখে সোফায় বসে আছে। ওদের দেখে ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল—"কখন বেরিয়েছিলে? এত ঠান্ডায় বাইরে ঘুরছো। অসুখ বাধাবে নাকি?"

দেবী কাঁধ নাচাল—"কী আবার হবে? বাড়িতে ভালো লাগছিল না। তাই ঘুরে এলাম। সোহেল তুমি কখন এলে?" সোহেল বলল—"কখন এলাম? আধঘণ্টা হবে। মার সঙ্গে দেখা করে যাব।"

ঠিক তখনই মেহরীন বাড়ি ঢুকল। মাথায় জড়ানো কালো স্কার্টের ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা বরফ। ওভারকোট খুলতে খুলতে হাসি মুখে বলল—"আজ যে দেখি হাউস ফুল।" আমি আরো আগেই আসতে পারতাম। রাস্তাঘাটে কি ভিড়!"

সোহেল হঠাৎ মেহরীনকে জড়িয়ে নেচে নেচে গান ধরল—

মাইসোর মসালা, শাহীনের রেজালা
বাবা বিশ জর্দা, মরে কাঠ পাবদা
অপূর্ব গিরিজা, শাড়ি কিনে বাড়ি যা
লইট্টা শুঁটকি, শাহী পান, ভেটকি
লইট্টা শুঁটকি, গুটকা গুটকি....

রাজা আর দেবী হেসে অস্থির। মেহরীন ছেলেকে ঠেলে দিয়ে বলল—"নাটক কইর‍্যা মাথাটা গ্যাছে। এইটা তোদের নাটকের

গান নাকি?" সাহেল হাসল—"এটা তোমাদের জয়কিশান হাইট্স্ এর টাইটেল্ সং। প্যারেডের দিন গাইতে গাইতে যাবে।" রাজাও মজা পেয়ে কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে গাইতে শুরু করল—"লইট্টা শুঁটকি, গুট্কা গুট্কি, লইট্টা শুঁটকি......"—"তোরা কেবল শুঁটকি আর ভেট্কি দেখিস! ভালো নামগুলি দেখিস না? একটা বাংলা বইয়ের দোকান খুলসে। নাম দিয়ে 'ভাষার জন্য ভালোবাসা'। দোকানে সারাদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়।"

দেবী আর রাজার জন্যে সোহেল দুটো ক্রিসমাস গিফ্ট এনেছে। ওদের একটু খুলে দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল। অনিলের মেজাজ বুঝে সাহস পেল না। আজ সন্ধে থেকে তার রাগ রাগ ভাব। রাগটা দেবীদের ওপরে না সোহেলের ওপরে, দেবী বোঝার চেষ্টা করছিল। ডিনার খেতে বসে অনিল রাজাকে লেখাপড়ার জন্যে লম্বা লম্বা উপদেশ দিচ্ছিল। যেন দেবীর চেয়ে রাজাই আগে কলেজে যাবে। রাজা এখনও হাইস্কুলে পৌঁছোয়নি। ক্রিসমাসের ছুটিতে পড়াশোনার কী আছে? হোম-ওয়ার্ক ও থাকে না।

রাজা চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল। মেহরীন ওর প্লেটে বিরিয়ানি দিতে দিতে বলল—"ছুটি তো ছুটির জন্যই। ক্লাস শুরু হইলে, তখন আর সময় পায় কোথায়।"

—"অত সময় দিয়ে হবেটা কী? হাইস্কুলে ভালো গ্রেড না পেলে, স্যাট এর রেজাল্ট খারাপ হলে কোন কলেজে ঢুকবে? অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। রাজাকে সেটা বুঝতে হবে।"

সোহেল্ দুম করে বলে বসল—"রাজাকে মানে ? দেবীকে কলেজে পড়াবেন না? ওর গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজও ভালো হওয়া দরকার। দেবী, স্যাট-এর জন্যে কোর্স নিও। ক্যাপলান থেকে তো কোর্স দেয়।" দেবী বুঝতে পারছিল সোহেলের কথাগুলো বাবার পছন্দ হচ্ছে না। ঘরে ফোন বাজল। মেহরীন বিরক্ত মুখে রান্নাঘরে গিয়ে ফোন ধরল। অনিল ঠক করে জলের গেলাস্ টেবিলে রেখে সোহেলকে বলল— "এখন কলেজ টিউশন কত বেড়ে গেঁছে জানো? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? দুজনকে পড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আই ক্যান্ট অ্যাফোর্ড দ্যাট।"

— "সো, ইউ আর গোইং টু ডিপ্রাইভ্ দেবী!" অনিল চিৎকার করে উঠল—"দেন হোয়াই ডোন্ট ইউ হেলপ মি? টেক সাম্ ফাইন্যালশিয়াল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড......."

মেহরীন প্রায় ছুটে এল— "না সোহেলের কোনো দায় নাই। আপনি ওরে কলেজে পড়ান নাই। লোন্ নিয়া পড়ছিল। বাকি খরচ আমি দিসিলাম।"

সোহেল উঠে দাঁড়িয়ে মাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল— প্লিজ, তোমরা ঝগড়া বন্ধ করো। আমি বাবুজীর ডিফিকাল্টি বুঝতে পারছি। আমার কমেন্ট করা ঠিক হয়নি। দেবী, আয় অ্যাম রিয়েলি সরি...।"

দেবী মাথা নিচু করে বসেছিল। সোহেলের এত খারাপ লাগছিল। অনিলের দুর্ব্যবহারের জন্যে তো বটেই, সোহেলের আরো রাগ হচ্ছিল নিজের মার অ্যাটিচিউড দেখে। কীভাবে কিচেন থেকে ছুটে এল। সোহেলের কোনো দায় পড়েনি বলে

শুধু শুধু মেয়েটাকে অপমান করল। অথচ ও মাকে কত রেসপেক্ট্ করে। মা নিজেই সেটা বলেছে। আজ আর সে কথা ভাবল না। এখন নিজের ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসে আছে। সোহেল একটা বয়সে বাড়িতে অনেক ঝগড়া, অশান্তি দেখেছে। আজকাল বিরক্ত লাগে। বিশেষ করে ক্রুয়েলটি ব্যাপারটা সহ্য করা যায় না। দেবীর সঙ্গে অনিল সেরকমই করছে। দেবীর জন্যে সত্যিই ওর দুঃখ হচ্ছিল।

সোহেল রান্নঘরে গিয়ে দেখল দেবী বাসনপত্র ধুয়ে রাখছে। ওকে দেখে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—"মেহরীন আন্টি কি শুয়ে পড়েছেন? খুব রেগে গেছেন না? বাবা যে কেন তোমার কাছে কলেজের টাকা চাইতে গেল।"

সোহেল দেবীর পিঠে হাত রাখল— "ফরগেট অ্যাবাউট ইট। তুমি কলেজে ফাইন্যানশিয়াল এইড এর জন্যে অ্যাপ্লাই করবে। ইনফ্যাক্ট্, আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম।"

— "প্লিজ, ডোন্ট্ ট্রাই টু ডু দ্যাট। আমি এখানে থাকব কিনা তারই ঠিক নেই। হাইস্কুল শেষ হলে ফিরে যাব ভাবছি।"

— "তোমার পড়াশোনার কী হবে?"

— "ওখানে পড়ব। কলকাতার কলেজে তো হাজার হাজার ডলার লাগবে না।"

ওদের কথার মাঝখানে মেহরীন রান্নঘরে এল। সোহেলকে বলল— "ওয়েদার ভালো না। বরফ থেমে এখন আবার বৃষ্টি নামছে। আজ রাত্রে আর ব্রুকলিনে যাস না।"

সোহেল একটু পরেই বেরিয়ে পড়ল। কাল সকালে উঠে অফিস আছে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে না ফিরলে অসুবিধে হয়।

মাঝে মাঝে উইক এন্ডে সোহেলের সঙ্গে দেবীর দেখা হয়। একদিন মেহরীনের সঙ্গে দেবী আর রাজা ডাউন টাউনের ছোট থিয়েটার হলে গিয়ে সোহেলদের ইংরিজি নাটক দেখে এল। এভাবেই দেখাশোনা হতে হতে দেবী একদিন সোহেলের কাছে ওর বাবার পুরোনো ঘটনাগুলো শুনেছিল। নতুন করে আর কত দুঃখ হবে? তবু বাবার ওপরে বিতৃষ্ণা আরো যেন বেড়ে গিয়েছিল। দূর থেকে মাকে সব কথা জানানো যায় না। কলকাতা যাওয়ার জন্যে মন অস্থির হচ্ছিল। নিবছর পরে গরমের ছুটিতে দেবী রাজাকে নিয়ে কলকাতায় গেল। মা আর পাপুকে কাছে পাওয়ার আনন্দ, ঠাকুমার আদর, কৃত্তিবাস লেনের পুরোনো বাড়িটার উঠোনে সন্ধেবেলায় বেলফুলের চেনা গন্ধ, দেবী যেন স্বপ্ন দেখছিল। প্রথমদিনটা প্রায় ঘোরের মধ্যে কাটল। দেবী মাকে একটু একা পাওয়ার চেষ্টা করছিল। বুকের ভেতর অনেক কথা জমে আছে। তিন বছরের অজস্র মুহূর্তের অনুভূতি। শুধু মাকেই যা বলা যায়।

জবা কদিন টেলারিং শপ থেকে ছুটি নিয়েছিল। ছেলেমেয়ের জন্যে নানা রকম রান্না করছে। সময়-অসময় নেই, পাড়ার লোকজন, আত্মীয়-স্বজন চলে আসছে। জবাকে নিরিবিলিতে একা পেতে হলে সেই রাত দশটা। কখনো দুপুরের অবকাশে, কখনো রাতের নির্জনতায় দেবী মাকে পুরোনো ঘটনাগুলো বলেছিল। ওর ধারণা, মা হয়ত অনেক কিছুই অনুমান করে।

তবু, সব কথা তো জানে না।

দেবী জিজ্ঞেস করেছিল—“বাবা কেন নিউইয়র্কে আবার বিয়ে করছিল তুমি জানো? কী বুঝিয়েছিল তোমাকে?”

— "বিয়ের কথা তো চিরকাল অস্বীকার করে গেছে। বলত মুসলমান বিয়ে করে ধর্ম ছাড়ব নাকি? ওকে মিস্ট্রেস রেখেছি।" দেবী প্রতিবাদ করে উঠল—"মেহরীন আন্টি ওরকম মানুষ নয়। বাবা বিয়ে করতে চেয়েছিল বলে রাজি হয়েছিল। তখন দুবছর হলো ওর হাসবেন্ড মারা গেছে। সোহেলকে নিয়ে একাই থাকত। জ্যাকসন হাইটস্ এ জুয়েলারি স্টোরে চাকরি করত।" জবা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল— "হ্যাঁ তারপরেই আমার সংসার ভাঙল। অত বড় ছেলে নিয়ে একটা লোকের সঙ্গে থাকতে লজ্জাও হল না।"

দেবী একটু চুপ করে থেকে বলল—"মেহরীন আন্টি তখন উইডো। কিন্তু বাবা কী করে পারল? আসলে বাবা তখন জাহাজ থেকে পালিয়ে আমেরিকায় থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ভিসা নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে বাংলাদেশি রেস্টোরেন্টে কাজ করত। ধরা পড়লে ডিপোর্টেশন। গ্রিনকার্ড পাওয়ার জন্যে প্রথমে একজন স্প্যানিশ মেয়েকে অ্যাপ্রোচ করেছিল। তাকে পাঁচ হাজার ডলার দিতে হবে। রেজিস্ট্রির পর দু বছর একসঙ্গে থেকে সে বাবাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। ইমিগ্রেশন পাওয়ার জন্যে বাবা সেই প্ল্যানই করেছিল। কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার পাবে কোথায়? বিয়েটা হল না!"

জবা সময়টা অনুমান করার চেষ্টা করছিল— "এটা তুই কবেকার কথা বলছিস? মাঝে সে একবার বছর তিনেক এল না, তোর মনে আছে?"

—"এটা প্রায় তেরো/চোদ্দো বছর আগের ঘটনা। সোহেলের কাছে যা শুনেছি। ঐ সময় বাবা একজন বাংলদেশি রেস্টোরেন্ট

ওনারের কাছে মেহরীন আন্টির খোঁজ পেয়েছিল। এবার আর টাকা পয়সার ডিল্ নয়। বাবা মেহরীন আন্টিকে বিয়ে করে নিল। গ্রিন কার্ড না হওয়া পর্যন্ত কলকাতায় আসেনি।"

— "তোর সঙ্গে বুঝি ছেলেটার খুব ভাব? ওদের সঙ্গে বেশি মেলামেশার দরকার কী? ওর মাকে তুই ভালো বলছিস? জেনে শুনে একজন ম্যারেড লোককে বিয়ে করল কেন? তার যে এখানে বউ আছে, দুটো ছেলেমেয়ে আছে জানত না?"

দেবী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল—"না মা, মেহরীন আন্টি তখন সব কথা জানত না। বাবা নিজেকে ডিভোর্সড বলেছিল। তুমি এখানে আমাদের নিয়ে আলাদা থাক। বাবা অ্যালিমনি দেয়। বাবার মিথ্যে কথাগুলো মেহরীন আন্টি অনেক পরে ধরতে পেরেছিল। তখন থেকে ওদের রিলেশনটা স্ট্রেইন্ড হয়ে গেছে।"

জবার গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ল—"রিলেশন! তুই প্রেম ভালোবাসার কথা বলছিস? ওর মধ্যে ভালোবাসা বলে কিছু নেই রে দেবী। কোনোদিন ছিল না। বুঝত শুধু শরীর আর নিজের স্বার্থ। এই জন্যে বিয়েটা করেছিল। এত কাণ্ডের পরেও পাপু হল! ঐ মেহরীন কী করে মেনে নিল?"

— "তারপর থেকেই অশান্তি শুরু হয়েছিল। লিগ্যালি বাবা দুটো বিয়ে করতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছিল রাজা জন্মানোর পরই তোমাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। তাই মেহরীন আন্টির সঙ্গে সেকেন্ড ম্যারেজটা লিগ্যাল। মাঝে একবার এসে ইমিগ্রেশনের ফর্ম সই করাচ্ছে বলে তোমাকে দিয়ে একগাদা কাগজপত্রে সই করিয়ে নিল। তুমি না দেখে শুনে ডিভোর্সের কাগজে সই করে দিলে। বাবা কীভাবে তোমাকে চিট্ করল!

পাপুর কথাও ভাবল না।"

দেবী কাঁদছিল। জবা স্তম্ভিত। অনিলের কাছে তার প্রত্যাশা কিছু ছিল না। নিজের দুর্ভাগ্য, বঞ্চনার দুঃখ একরকম সয়ে গিয়েছিল। জানত মানুষটা কখনো বদলাবে না। এখানে সংসার রেখে, ওখানে যা করার করে যাবে। মাঝে মাঝে আসে। নিয়ম করে খরচ পাঠায়। দেবী আর রাজাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। জবা ভেবেছিল একদিন ওদেরও যাওয়া হবে। আর, আজ দেবী বলছে, অনিল ওকে ডিভোর্স করেছে। এখনও বিশ্বাস হয় না। মানুষ এমনভাবে ঠকাতে পারে? বউ, বাচ্চাকে পথে বসাতে পারে? এখন তাহলে শুধু দয়া করে টাকা পাঠায়? ক্ষোভে, দুঃখে অপমানে জবা স্তব্ধ হয়ে রইল।

প্রতিমা বুঝতে পারছিলেন কিছু একটা ঘটেছে। দেবীর মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ করছিলেন। তিনবছরে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। আমেরিকায় থাকলে বোধ হয় এরকম হয়। অল্প বয়সেই স্বাবলম্বী হাবভাব। সেটা ভালো। তবে দেবীকে যেন একটু চিন্তিত মনে হয়। মার সঙ্গে অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। পাশের ঘর থেকে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ পান। পাপু প্রতিমার কাছে শোয়। সেও কাল মাঝরাতে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বিড়বিড় করে বলল—"মা আর দিদি এখনো গল্প করে যাচ্ছে।"

শেষ পযর্ন্ত প্রতিমা সবই শুনলেন। দেবী আর জবা যাই বলুক, অনিলের ডিভোর্স নিয়ে তেমনি বিচলিত হলেন না। যা করেছে, সে তো অনেকদিন আগেই করেছে। তার জন্য কলকাতায় আসা বন্ধ করেনি। টাকা পাঠানো বন্ধ করেনি। এবারও দেবীর সঙ্গে অনেক ডলার পাঠিয়েছে। অকর্তব্য করছে না। জবা বলছিল অনিল টাকা দিতে বাধ্য। সাংসারটা কি জবার একার? প্রতিমা আর পাপুর খরচ নেই? জবার জন্যেও অনিল খোরপোশ দিতে

বাধ্য। অন্যায় কিছু বলেনি। ছেলের স্বরূপ প্রতিমা ভালোই জানেন। কত চালাকি করে গেল সারাজীবন। কিন্তু নিজেও কি শান্তি পেল। দেবীর তো বাবার ওপর রীতিমতো রাগ। রাজা অবশ্য কোনো কথায় থাকে না। দেবী বলে রাজা ছেলে বলে ওর জন্যে বাবা কলেজের খরচ দেবে। অথচ দেবীকে আর পড়াবে না। হাইস্কুল শেষ হলে বিয়ে দিয়ে দেবে। জবা বলে উঠল—"কখনো রাজি হবি না! আমার অবস্থা দেখছিস না?"

প্রতিমা মুখ নিচু করে তরকারি কাটছিলেন। দেবীর গলায় জেদ ফুটে উঠল—"বাবা চাইলেই তো হবে না। মেহরীন আন্টি, সোহেল, আমাদের স্কুলের গাইডেন্স কাউন্সেলর সবাই আমাকে হেলপ্ করবে। দরকার হলে কলেজ লোন নেব। একটা সলিউশন হবেই।"

প্রতিমা মুখ তুললেন—"দেখিস বাবা, শেষপর্যন্ত তোর বাবার সঙ্গে ঝগড়া লাগাস না। ও-ই তো তোদের নিয়ে গেছে। পরের কথায় নেচে এখন থেকে মাথা গরম করিস না। কলেজের তো দেরি আছে।"

দেবী মুখের ওপর শুনিয়ে দিল—"যাদের পর বলছ, ওরাই কিন্তু আমার ভালো চায়। মেহরীন আন্টি রাজি না হলে বাবা কোনোদিন আমাদের নিয়ে যেতে পারত না। এই যে তোমাদের জন্যে এত জিনিস নিয়ে এলাম, সেও মেহরীন আন্টি কিনে দিয়েছে। আমি চাইনি। নিজে থেকেই তো দিল?"

ছুটির শেষে দেবীরা নিউইয়র্কে চলে গেল। জবা যন্ত্রের মতো কাজকর্ম চালিয়ে যায়। কোনোমতে বাজার করে। দায়সারা ভাবে রান্না করে। এই সংসারে ওর থাকাটাই প্রহসন মনে হয়। একদিন টেলারিং শপ থেকে ফেরার পর প্রতিমা বললেন— "আজ

আবার প্রোমোটারের লোক এসেছিল, রবিবার আসতে বলেছি। এবার তুমি কথা বলবে।" জবা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল— "আমার অত বিষয়বুদ্ধি নেই মা। কথা বলার জন্য ছোটমামাকে খবর দিন। তাছাড়া, আমি এর মধ্যে থাকতেও চাই না।"

প্রতিমা ক্ষুব্ধ হলেন—"কেন? নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি হলে আমার সঙ্গে থাকবে না? তোমার মাথায় কী ঢুকেছে বলো তো?" জবার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। এক পলক চেয়ে থেকে বলল—

—"আপনার ছেলের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই। তবু এই ভাঙাচোরা বাড়িটার মায়া কাটাতে পারছি না।

এতবছর পরে কোথায় যাব বলুন?"

—"এই ভাঙাচোরা বাড়িটা আমার। এর জন্যেই দশবার প্রোমোটার আসছে। নতুন ফ্ল্যাট আর টাকা দেবে বলছে। তুমি এবার উকিল ডেকে সব কিছু বুঝে নিও জবা। মানুষকে আর বিশ্বাস হয় না।"

দেড় বছর পরে দেবী নিউটাউন হাইস্কুল থেকে পাস করে স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কে ভর্তি হল। কলেজের ক্যামপাস্ লং আয়ল্যান্ডে। ছুটিতে বাড়ি আসতে গেলে ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না। দেবী কলেজে ফাইন্যানশিয়াল এইড পেয়ে যেতে অনিল বাকি খরচপত্র দিতে আপত্তি করল না। রাজা হাইস্কুলে পড়ছে। সপ্তাহে দুদিন বিকেল বেলা এলমহার্স্ট হসপিট্যালে ভলান্টারি সার্ভিস করে। অন্যদিন স্কুল ছুটির পরে বাস্কেট বল প্র্যাকটিস্, স্কুলের নিউজলেটার কমিটির কাজকর্ম, স্প্যানিশ ক্লাবের মিটিং রাজার একস্ট্রা কারিকিউলার অ্যাক্টিভিটি বেড়েই চলেছে। দেবী ওকে রাতের দিকে ফোন করে।

পড়াশোনার খবর নেয়। কলেজে দেবীর বেশ কজন নতুন বন্ধু হয়েছে। পড়াশোনা, পরীক্ষার চাপ, সাউথইস্ট এশিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নানা অনুষ্ঠান, দেবীর প্রথম বছরটা দ্রুত শেষ হয়ে গেল। সোহেলের সঙ্গে আগের মতো দেখা হয় না। দেবী আশা করেছিল গরমের সময় বাড়িতে আসার পর মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখা হবে। দেবী সামার জব খুঁজছিল। তিনমাসের জন্যে কাছাকাছি একটা ব্যাংকে চাকরি পেয়ে গেল। ছুটির দিনে সোহেল যদি বা আসে। বেশিক্ষণ থাকে না। ব্রুকলীন কলেজে নাইট কোর্সে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছে। চাকরি, পড়াশোনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। শনি/রবিবার সময় কাটানোর জন্যে দেবী মাঝে মাঝে জ্যাকসন হাইট্স এ ঘুরে আসে। মেহরীনের দোকানে কয়েক ঘণ্টা থেকে ওকে সাহায্য করে।

অনিলের মাথায় নানা চিন্তা। এরপর রাজা কলেজে যাবে। তার খরচ আছে। এখানকার বাড়ির জন্যে মাসে মাসে ব্যাংকের ঋণ শোধ করে যাচ্ছে। মর্টগেজের অর্ধেক পেমেন্ট দেয় মেহরীন। বাকিটা অনিল। রাজা, দেবীকে আনার পর সংসার খরচ বেড়েছে। এর ওপর কলকাতার বাড়িতে টাকা পাঠানো। কত বছর মাকে দেখতে যাওয়া হয়নি। ছোট মেয়েটা বোধ হয় বাবাকে ভুলেই গেছে। মা হঠাৎ বাড়িটা প্রোমোটারকে দিয়ে দিল। অনিলের সঙ্গে একবার পরামর্শ করল না। নতুন ফ্ল্যাট না পাওয়া পর্যন্ত ওরা টালিগঞ্জের দিকে একটা ভাড়া বাড়িতে আছে। অনিলের একবার দেখে যাওয়া দরকার। কিন্তু পারছে কোথায়? কোনকালে জবাকে ডিভোর্স করেছে। তবু অনিল কোলকাতায় যাবে শুনলে মেহরীনের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। দুটো সংসার

রাখার যে কি জ্বালা অনিল ক্রমশ হাড়ে হাড়ে বুঝছে। রোজগারের জন্যে সারাজীবন খেটে যাচ্ছে। ইদানীং বড় ক্লান্ত লাগে। শরীরটা বিশ্রাম চায়। অথচ চাকরি ছাড়ার উপায় নেই। অনিলের একটাই আশা। বুড়ো বয়সে মেহরীন ছাড়াও ছেলে, মেয়ে নিশ্চয়ই দেখবে।

দেবীর কলেজে দ্বিতীয় বছর চলছে। ইকনমিক্স ক্লাসের রাহুল শর্মা ওকে দিওয়ালি ফেসটিভ্যালে গান গাইতে ডেকেছিল। রাত দশটা পর্যন্ত প্রোগ্রাম দেখে দেবী কলেজ ডর্মে ফিরে এল। ওর রুম-মেট ক্রিস্টিনা কমপিউটারে বসেছিল। দেবীকে খবর দিল সোহেল ওকে দুবার ফোন করেছে। দেবীকে ওর সেল্ নাম্বারে কল্ করতে বলেছে। দেবী ঠিক করল এখনই ফোন করবে না। সোহেল আজকাল ওর সঙ্গে দেখা করার সময় পায় না। সামারে একটা ব্রডওয়ে-শো দেখার কথা ছিল। তাও সোহেলের সময় হল না। হঠাৎ আজ দু বার ফোন কেন? দেবী জামাকাপড় বদলাচ্ছে, তখন ডোরবেল বাজল। এত রাতে কে এল? ক্রিস্টিনা উঠে গিয়ে দরজার লক্ ঘুরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। সোহেল দাঁড়িয়ে আছে। দেবী ফিরেছে কি না জিজ্ঞেস করায় ক্রিস্টিনা ওকে ভেতরে ডাকল। সোহেলের মুখ দেখে ওর মনে হল নিশ্চয়ই খুব দরকারেই এসেছে। না হলে এত রাতে কলেজ ডর্মে আসবে কেন?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেবী কেমন থতমত খেয়ে গেল—তুমি? ফোন করেছিলে? কী হয়েছে সোহেল?

ইউ লুক ভেরি আপসেট! হোয়াট হ্যাপেন্ড্? সোহেল কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল—“খবর ভালো নয় দেবী। আমি

তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে কনট্যাক্ট্ করার চেষ্টা করছিলাম। শেষপর্যন্ত নিজেই চলে এলাম।"

দেবীর গলার স্বর কেঁপে উঠল—"কী হয়েছে বলছ না কেন? রাজা কোথায়? ওর কিছু হয়নি তো?"

—"দেবী, বাবুজী মারা গেছেন। হি হ্যাড এ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।" মুহূর্তের আশংকা, তীব্র উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাচ্ছে। দেবী যেন স্বার্থপরের মতো এক গোপন স্বস্তি অনুভব করছিল। তবে কি রাজা ছাড়া ওর আপনজন কেউ নেই? কারুর বিপদ, দুঃসংবাদ ওর মনকে স্পর্শ করে না? বাবার মৃত্যু সংবাদও নয় ?

ক্রমশ দেবীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ফিরে এল। বাবা চলে গেছে। ও জানতেও পারল না। কেন? বাবা কি অভিমান করে নিজের অসুখের কথা জানাতে দেয়নি? সোহেল একেবারে শেষ খবর দিতে এল?

দেবী বলল— "বাবার হার্ট অ্যাট্যাক হল। রাজা আমাকে খবর দিল না? কখন কী হল সোহেল?"

সোহেল সেই বেদনার্ত মুখের দিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিল—রাজা এখানে ছিল না দেবী। স্কুল থেকে ওয়াশিংটন গিয়েছিল। খবর পেয়ে চলে এসেছে। তোমাকে ফোনে কনট্যাকট্ করতে পারছিলাম না...।

দেবী সোহেলের সঙ্গে অনেক রাতে কুইনস্ এর বাড়িতে এসে পৌঁছোল। তখনো মেহরীনকে ঘিরে ওর চেনাশোনা কজন মহিলা বসে অছে। বাইরের ঘরে কার্পেটে বসে রাজা কাউকে ফোন করছিল। সেখানে দু জন বাংলাদেশি ভদ্রলোক সোহেলের অপেক্ষায় ছিলেন। সোহেল বলল—দেবী মার সঙ্গে দেখা করে এসো। তারপর ফিউন্যারালের ডিটেইলস্ জানাচ্ছি।"

রাজা ফোন রেখে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে যাবার সময় বলল—"কাল বিকেলেও বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হল। হি নেভার মেনশনড আবাউট হিস্ ডিস্কমফর্ট। তখনো যদি চেস্টপেইনের কথা বলত, ডিরেক্ট্‌লি অ্যাম্বুলেন্স্ কল করে দিতাম।" দেবীর মুখে ম্লান হাসি— "তোকে বদার করতে চায়নি। ইউ আর দ্য ওন্‌লি পার্সন, যা্কে বাবা সব সময় খুশি রাখতে চাইত।" রাজার চোখ জলে ভরে গেছে। দেবী ওকে ঘরে পাঠিয়ে মেহরীনের কাছে গেল।

বিছানার পাশে একটাই আলো জ্বলছে। সেদিকে দুজন মহিলা বসে আছেন। অন্যদিকে আলো নেভানো। আধো অন্ধকারে মেহরীন শুয়ে আছে। দেবী কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেহরীন ওর হাত ধরে কতক্ষণ কোনো কথা বলল না। দেবী খাটের ধারে দাঁড়িয়ে আছে দেখে এক মহিলা বললেন—"তুমি ভাবীর কাছে বসো। কলেজ থেকে আসছ। একটু পরোটা, সবজি নিয়া আসি, যেটুক পারো খাও।"

দেবী বাধা দিল—"এখন কিছু খাব না। ইচ্ছে করছে না।" মেহরীন চোখের জল মুছে উঠে বসল। দেবীর দিকে উদভ্রান্তের মতো চেয়ে থেকে বলল—"তোমার বাবাকে বাঁচাইতে পারলাম না। সারাদিন আমি দোকানে বইসা আছি। তিনি একবার আমারে বুকের যন্ত্রণার কথা বললেন না। সকালে কাজে যান নাই। সর্দি জ্বরে হাঁফ ধরতেছে বলে বাসায় থাকলেন। আমি ফিরা আইস্যা দেখি শুইয়া পড়লেন। তখনও বুঝি নাই...মেহরীন কপালে হাত রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অন্য মহিলা সান্ত্বনা দিল—"তুমি তো যা করার সব করেছ। মাঝরাতে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ওকে হস্‌পিট্যালে নিয়ে গেছ।

ছেলেমেয়ে বাড়িতে থাকলেও এর বেশি কি করতে পারত বলো?”

দেবীর হঠাৎ মনে হল যেন অন্য কোনো বাড়িতে এসেছে। এই শোক ওকে গভীরভাবে স্পর্শ করছে না। বাবা মারা গেছে। তার জন্য শোক করছে অন্য এক মানুষ। মা কোথায় পড়ে আছে। ঠাকুমাও কি জানে তার ছেলে বেঁচে নেই? আজ এ বাড়িতে এত লোক আসছে-যাচ্ছে, তাদের কাউকে দেবী চেনে না। মেহরীন আন্টি, সোহেল, অন্য সমাজের মানুষ। এই প্রথম দেবী উপলব্ধি করল এদেশে ওদের কেউ নেই। শুধু বাবা ছিল নিজের লোক। এ বাড়ির সঙ্গে কি সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে? সকলের কাছে যেন মেহরীন আন্টির দুঃখটাই বড় হয়ে উঠেছে। একজনও ওদের সঙ্গে বাবার কথা বলছে না। যেন, বাবা দেবী, রাজার কেউ ছিল না। রাজাও বোধ হয় একা একা নিজের ঘরেই বসে আছে। দেবী উঠতে যাচ্ছিল। সোহেল ভেতরে এল। মেহরীনের গায়ে হাত রেখে বলল—“এবার শুয়ে পড়ো। কখন ট্র্যাংকুইলাইজার দিয়েছি। একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো।”

মহিলাদের বাইরে ডেকে সোহেল মার ঘরের দরজা টেনে দিল। দেবীকে বলল— “রাজার ঘরে চলো। বাবুজীর ফিউনার‍্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে। তাও তোমাদের যদি কোনো রিচ্যুয়্যাল্ থাকে, উই হ্যাভ টু নো দ্যাট্”।

আজ লং আয়ল্যান্ড থেকে আসার পথে সোহেলের কাছে দেবী শুনেছিল বাবার দেহ হসপিট্যাল মর্গ থেকে ফিউনার‍্যালী হোমে চলে গেছে। কাল সকালে ওখানে কিছুক্ষণ রাখার পর সেমেটরিতে নিয়ে যাবে। সেমেটরি শুনে দেবী অবাক হয়েছিল।

বাবা তো হিন্দু ছিল। নিজেই বলেছিল মেহরীন আন্টিকে বিয়ে করার জন্যে ইসলামে কনভার্ট করেনি। তাহলে ওরা কবরখানায় নিয়ে যাবে কেন? নাকি, বাবা সত্যিকথাটা জানাতে চায়নি? কিন্তু বাবাকে তো দেবী কখনো নামাজ পড়তে দেখেনি। মেহরীন আন্টি ভোরবেলা ফজরের নামাজ পড়ে কাজে যায়। ওদের ধর্মে যেমন নিয়ম, তেমন ভাবে চলে। বাবা তো কিছু মানত না। দেবীর ইচ্ছে হয়েছিল কথাটা সোহেলকেই জিজ্ঞেস করে। বাবা নিজের ধর্মে ছিল, না, বিয়ের জন্যে মুসলমান হয়েছিল, সোহেল নিশ্চয়ই জানে। শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়নি। সারাটা পথ সোহেল নিজের মার জীবনের স্ট্রাগল্, শোক তাপ, দুঃখ কষ্টের কথা বলছিল। কত কম বয়সে সোহেলের বাবা মারা গিয়েছিল। ছেলেকে আমেরিকায় মানুষ করার জন্য মেহরীন আন্টি বাংলাদেশে ফিরতে চায়নি। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে, কী পরিশ্রম করে নিজের দোকানটা দাঁড় করিয়েছে। কীভাবে দেবী আর রাজাকে নিজের সংসারে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। বাবার শেষ সময়েও মেহরীন আন্টিই পাশে ছিল। সোহেল শুধু মার দুঃখের কাহিনি বলে যাচ্ছিল এর মাঝখানে বাবার ধর্মের কথাটা তোলা হয়ত সেন্‌সিটিভ ইস্যু হয়ে যাবে। এই ভেবে দেবী চুপ করে থাকল।

কিন্তু এখন সোহেল দেবীদের রিচ্যুয়্যাল্ এর ব্যাপারটা জানতে চাইছে। তাহলে তো জিজ্ঞেস করাই যায়। রাজার ঘরেই কথাবার্তা শুরু হল। দেবী সরাসরি জানতে চাইল— ফিউনার‍্যাল হোমের পরে আমরা সেমেটরিতে যাচ্ছি কেন? ওখানে তো শুধু বেরিয়াল হয়।”

সোহেল ওর মুখের দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থেকে বলল—

—"দেবী, প্লিজ ট্রাই টু লিস্‌ন। আমি এমন কিছু করব না, যা তোমাদের রিলিজিয়নকে কন্ট্র্যাডিকট্ করে।

ফিউনার‍্যাল হোমে বাবুজীর জন্য ভিউইং হবে। ওর অফিসের কো-লিগ মায়ের জানাশোনা লোকজন, আমার কজন বন্ধু, রাজার স্কুলের বন্ধুরা, দু/চারজন নেবার ঐখানে যাবে। বাবুজী সম্পর্কে কিছু বলার ইচ্ছা হলে বলবে। তার আগে তুমি আর রাজা কিছু বলতে পারো। ভিউইং শেষ হলে ওখান থেকে উডলন সেমেটারি। ভিতরে আলাদা হল আর ক্রিমেটোরিয়াম আছে। জ্যাকস্‌ন হাইটস্ এর সুরেশ আঙ্কল একজন হিন্দু প্রিস্ট্‌কে নিয়ে আসবেন।"

রাজা বলল—"দিদি তোকে জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। বাবার জন্যে একটা ব্ল্যাক স্যুট্ দিয়ে এসেছি। বাবা তো ইন্ডিয়ান জামাকাপড় পরতও না।"

সোহেল দেবীকে জিজ্ঞেস করল—"এবার তুমি বলো, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কাস্টম্ রাজাই ক্রিমেশনের আগে প্রিস্টের সঙ্গে পুজো করবে তো?"

দেবী কখনো শ্মশানে যায়নি। ওদের কৃত্তিবাস লেনের বাড়ি থেকে শ্মশান দূরে ছিল না। তবু, দাদুর বেলাতেও ওরা যায়নি। শুধু একটা কথা মনে আছে। দাদু যখন মারা গেলেন, বাবা কলকাতায় যেতে পারেনি। ছোটকাকা মুখাগ্নি করেছিল। শ্মশান থেকে ফিরে ঠাকুমাকে বলেছিল—আমাদের কি নিষ্ঠুর প্রথা মা। দেখ, চিরকাল এসব নিয়ম থাকবে না। ঠাকুমা বলেছিল—চিরকাল থাকবে। যারা মানতে চায় ঠিক মানবে। নিয়ম কি এমনিই হয়? তার কারণ থাকে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকে।

দেবীকে অন্যমনস্ক দেখে রাজা জিজ্ঞেস করল—"তুই কাল প্রিস্টের সঙ্গে কথা বলতে চাস? এতরাতে তো কল্ করা যাবে না।"

দেবী মাথা নাড়ল— "না, আমি ঠাকুমার কথা ভাবছি। মা, পাপু কেউ তো জানে না। কলকাতায় ফোন করবি না?"

সোহেল সামান্য ইতস্ততভাবে ওদের বোঝাতে চাইল হাতে আর বেশি সময় নেই। ভোরবেলা উঠে সকলকে তৈরি হয়ে নিতে হবে। দেবী যদি ওর স্কুলের পুরোনো বন্ধুদের খবরটা জানাতে চায়, সকালেই ফোন করতে হবে। নটা থেকে দশটার মধ্যে ভিউইং। প্রিস্ট্ রাজাকে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরতে বলেছে। দেবী যেন সময়মতো গুছিয়ে রাখে। আমেরিকায় কোনো ব্যাপারে লেট্ করা যাবে না। নট্ ইভন্ ফর ফিউনার‍্যাল। সোহেল চলে যেতে রাজা বলল—"সোহেল ভাই কাল মিড নাইটে হসপিট্যালে গিয়েছিল। তারপর থেকে সব অ্যারেঞ্জ করে যাচ্ছে। তোকে আনতে লং আয়ল্যান্ডে গেল। বাবার জন্যে আমরা কিছুই করলাম না।"

দেবী সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল—"সোহেল খুব কমপ্যাশনেট। স্টেপ-সন্ হিসেবে অনেক বেশিই করছে। রাজা, তোর কাজটা কিন্তু আরো কঠিন। কাল ক্রিমেটোরিয়ামে নিজেকে স্টেডি রাখিস।"

বাকি রাতটুকু দেবীর জেগেই কেটে গেল। রাজা এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে দেবী ওকে ডেকে দিতে খানিক ঝিম মেরে বসে থাকল। দেবী তাড়া দিল—দেরি করিস না। চান করে রেডি হতে হবে।

রাজা বলল—"বাবা আরো জোরে ডাকত। হি ওয়াজ লাউডার দ্যান ইউ। নয়তো রোজ স্কুল বাস মিস্ করে যেতাম। নাউ হু ইজ গোইং টু ওয়েক মি আপ?"

দেবী ভাবছিল সবাই মেহরীন আন্টিকে ঘিরে আছে। সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাজা যে কী হারাল, সে শুধু ও-ই জানে। সেই অনিশ্চয়তার কথা দেবীর ভাবতেও ভয় হচ্ছে।

মাস তিনেক পরে মেহরীন দেবীকে ডেকে পাঠাল। যেদিন রবিবার। মেহরীন সকালের দিকে রাজাকে জ্যাকসন হাইটস্-এর দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ফারুক পুরোনো লোক। দুজনে মিলে বিকেল পর্যন্ত চালিয়ে নেবে। দেবী আসার পর ওকে লাঞ্চ খেতে দিয়ে মেহরীন জিজ্ঞেস করল—"তোমার গ্র্যাজুয়েশনের কি দুই বছর বাকি আছে?"

দেবী প্রশ্নের কারণটা বোঝার চেষ্টা করছিল। আজকাল এরকম হচ্ছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ভয়, সন্দেহ জাগছে। মেহরীন আন্টি কেন হঠাৎ পড়াশোনার খবর নিচ্ছে?

দেবী উত্তর দিল—"হ্যাঁ, এই সেপ্টেম্বরে জুনিয়ার ইয়ার শুরু হবে। তারপর সিনিয়ার ইয়ার। তখন তো রাজাও কলেজে চলে যাবে।"

—"আমি খুব চিন্তায় পড়ছি দেবী। এত খরচ দেওয়া তো সম্ভব নয়। তারজন্যই তোমাকে আসতে বললাম।" দেবী ভয়ে ভয়ে বলল—"আমি নিজের কলেজ লোন চাকরি পেয়ে শোধ করে দিতে পারব। শুধু ডর্মে থাকার খরচটা বাবা পে করতেন।"

—সেইটা তেমন সমস্যা নয়। দুইটা বছর টানতে পারব। কিন্তু রাজার জন্য চার বছর টিউশন দেওয়া কি সহজ কথা! তোমার

বাবা তার জন্য একটা ফান্ড করছিলেন। সেও অ্যামাউন্ট হিসাবে বেশি নয়।”

দেবী ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। মেহরীন আন্টি কী বলতে চাইছেন? রাজার পড়াশোনা বন্ধ করে দেবেন? হাইস্কুল ডিপ্লোমা নিয়ে কী করবে রাজা? ওঁর দোকানে গিয়ে বসবে? কেন? বাবা মারা যাওয়ার পর মেহরীন আন্টি ইনশিওরেন্সের পেমেন্ট পাননি? বাবার অফিস থেকে কিছু পাননি? বাবার সেভিংস ছিল না? এই বাড়িটারও অর্ধেক অংশ ছিল বাবার। ওরা তো তার কোনো কিছু দাবি করছে না। মেহরীন আন্টি যেন ওকে দয়া দেখাচ্ছেন। শুধু দেবীর দুটো বছরের ডর্মের খরচ কোনো মতে চালিয়ে দেবেন। অথচ রাজার জন্যে বাবার রেখে যাওয়া টাকাকড়ি কিছুই দেবেন না। দেবীর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। আর কত অবিচার সহ্য করা যায়? কেন ওরা বারবার বঞ্চিত হবে? ছোটবেলা থেকে অভাব অনটন দেখে আসছে। তারজন্যে তো দায়ী এই মহিলা! এত উত্তেজনার মধ্যেও দেবী বুঝতে পারছিল ওর মেজাজ হারালে চলবে না। রাজাকে এখনও এ বাড়িতে থেকে হাইস্কুল পাস করতে হবে। দেবীর কলেজ শেষ হয়নি। এ অবস্থায় ওঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না। ওদিকে বাবা মারা যাওয়ার পর কলকাতার বাড়ির খরচ পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। প্রোমোটারের কাছ থেকে ঠাকুমা দু লক্ষ টাকা পেয়েছেন। ওদের আপাতত সেটাই ভরসা। নানা চিন্তায় দেবী দিশাহারা হয়ে পড়ছে। একবার সোহেলের সঙ্গে কথা বলে দেখবে? কিন্তু ও যদি নিজের মাকেই সাপোর্ট করে, তবে দেবী আর কার ভরসা করবে?

কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে দেবী ওর রুমমেট ক্রিস্টিনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করল। ক্রিস্টিনার বাবা ল-ইয়ার। ও হয়তো কোনো বুদ্ধি দিতে পারবে। ক্রিস্টিনা বলল— তোমার বাবার উইল না থাকলে তোমার স্টেপ-মাদারই কিন্তু সব কিছু পাবেন। তুমি লিগ্যাল অ্যাক্শন নিতে পারো। তবে তার জন্যে ল-ইয়ার দরকার। ইউ মে হায়ার সাম্-ওয়ান হু উইল গিভ ইউ প্রপার অ্যাডভাইস।"

দেবী কোথা থেকে উকিলের খরচ দেবে? সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির অ্যাকটিভিস্ট্ গ্রুপ হয়তো সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ল-ইয়ারের চিঠি পাঠানো মানে মেহরীন আন্টিদের সঙ্গে সম্পর্ক চলে যাবে। পায়ের নীচে সামান্য জমিটুকুও থাকবে না। আর সোহেল? না, সোহেল কষ্ট পায়, এমন কাজ দেবী করতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত সোহেলকেই দেবী নিজেদের সমস্যার কথা ফোনে জানাল। আর তখনই শুনল বাবা উইল করে যায়নি। তবে রাজার কলেজের জন্যে আলাদা সেভিংস রেখে গেছে। দেবী যেন ওর মাকে ভুল না বোঝে। ইনশিওরেন্সের চেক্ থেকে দেবী আর রাজা যাতে কিছু অংশ পায়, সোহেল মেহরীন আন্টিকে সে ব্যাপারে বোঝাবে। দেবী মন দিয়ে পড়াশোনা করুক। এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

দেবী হঠাৎ বলল—"সোহেল আমাদের আজকাল দেখাই হয় না। কতদিন দেশে যেতে পারিনি। মাঝে মাঝে এত ডিপ্রেস্‌ড্ লাগে।"

—"ডোন্ট্ গেট আপ সেট। এভরি থিং উড বি ফাইন্। দেখা নিশ্চয়ই হবে। আমি কল্ করব।"

কলেজে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর একদিন শনিবার দুপুরে দেবী জ্যাকসন হাইট্স এ গেল। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি। মেহরীন আন্টির সঙ্গে দোকানে দেখা করে নেবে। তারপর সোহেলের ফোন পেলে ম্যান্হ্যাটনে যাবে। 'সাকিনাস্ রেস্টোরেন্ট' নামে একটা থিয়েটার দেখার ইচ্ছে আছে। সোহেল টিকিট পেলে দেবীকে জানাবে।

কবুতর হালাল মিট, গ্রোসারি অ্যান্ড ভিডিও কর্নারে মেহরীনকে পাওয়া গেল না। রাজা আর ফারুক দোকান সামলাচ্ছে। মেহরীন আন্টি গেলেন কোথায়? দোকানে ফারুক ডিভিডিতে 'হারানো সুর' চালিয়ে দিয়েছে। দেবী রাজাকে জিজ্ঞেস করল— "কি রে? আমি কতক্ষণ ওয়েট করব? আমাকে আসতে বললেন।" ফারুক মন্তব্য করল—"জুয়েলারি স্টোরে গেসেন। তুমি গিয়া দ্যাখো না! বোধহয় রাজ জুয়েল্স্ এ ঢুকসেন।"

দেবী এখন আন্দাজে কোন দোকানে ঢুকবে। রাজা এত ব্যস্ত যে কথা বলার সময় নেই। তারই মধ্যে বলল— "গুড নিউজ শুনেছিস? সোহেল ভাই কল্ করেছিল?"

— "কীসের গুড নিউজ? জানি না তো।"

—"সোহেল ভাই এনগেজ্ড্। ওর গার্লফ্রেন্ডকে মিট করেছিস?

বাবার ফিউনার‍্যালে এসেছিল।"

দেবী কি ভুল শুনছে? সোহেল এনগেজ্ড্? ওর গার্লফ্রেন্ড আছে? রাজা জানে। অথচ দেবী জানে না? অসম্ভব! সোহেল আজকেও ওকে ম্যানহ্যাটনে যেতে বলেছে।

দেবীর কথায় অবিশ্বাস ঝরে পড়ল— "কে ওর গার্লফ্রেন্ড? তুই চিনিস?"

রাজা শুনতে পেল না। টিভিতে উত্তমকুমারের সংলাপ চলছে। সুচিত্রা সেনকে বলছেন—কৌতূহল থাকা ভালো কিন্তু তার সীমা ছাড়ান উচিত নয়।

তবু দেবী সীমা ছাড়িয়ে গেল—"ফারুক ভাই, কথাটা সত্যি? সোহেল এনগেজড্?"

— "গতকালই অ্যানগেজড্ হইসে। নাসিমারে হিরার আংটি দিসে।" ভালোবাসা, ঈর্ষা, যন্ত্রণার আগুনে দেবীর দেহমন পুড়ে যাচ্ছে। সোহেল! সোহেল! সাতটা বছর বড় কম সময় নয়। এত কাছাকাছি এলাম, তবু...

— "নাসিমা! নাসিমা কে ফারুক ভাই? আপনি ওকে দেখেছেন?"

—"দেখসি কয়বার। ব্রুকলিনের রহমান সাহেবের মেয়ে। সোহেলের দলে নাটক করে।"

হারানো সুরের গান পেছনে ফেলে দেবী জয়কিশনগঞ্জের পথে নেমে এল। বই-এর দোকানের পাশ দিয়ে উদভ্রান্তের মতো হেঁটে চলেছে। সুমনের গান বাজছে—তোমাকে চাই, তোমাকে চাই....মাথার ভেতর সূক্ষ্ম যন্ত্রণার অনুভূতি। রাজা আজ বলল স্কলারশিপ পেয়ে যাব। রাজা আজ বলল সোহেল ভাই এনগেজ্‌ড। একদিনে এত আনন্দ, এত কষ্ট দেবী কখনো পায়নি। ব্যাগ খুলে সেল্‌ফোন বন্ধ করে রাখল। সোহেল ডাকলেও সাড়া পাবে না।

মেঘবালিকার জন্যে

হাসপাতালের পার্কিং গ্যারাজে গাড়ি রেখে এলিভেটরে উঠেছি। ড. মহান্তির সঙ্গে দেখা হল। এমনিতে কথাবার্তা বিশেষ হয় না। আমি দশটায় কাজে আসি। তিনটেয় ফিরে যাই। সব দিন সব ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় না। আজ ড. মহান্তি লবিতে পৌঁছে বললেন—"আমার মাদার ইন ল কাল রাতে অ্যাডমিটেড হয়েছেন। সিভিয়র স্প্যাজম্ ফ্রম অ্যাজ্‌ম্যাটিক ব্রংকাইটিস।"

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম। নিজের অফিসের দিকে যাওয়ার আগে বলে এলাম ওঁর শাশুড়িকে একবার দেখে আসব। ঘরে পৌঁছে দেখলাম সোফিয়া এসে গেছে। পেশেন্টস্ লিস্ট, প্যাথলজিক্যাল চার্ট দেখে সোফিয়ার সঙ্গে ডায়েট প্ল্যান নিয়ে বসলাম। একশো কুড়ি জন রুগীর জন্যে প্রতি সপ্তাহে তিন বেলার খাবারের মেনু ঠিক করা। হসপিট্যাল ক্যাটারারদের ফুড

স্যাম্পল্ পরীক্ষা করা, স্পেশ্যাল ডায়েটের পেশেন্টদের সঙ্গে কথা বলা, এই করতে করতে সময় চলে যায়।

সোফিয়া জিজ্ঞেস করল—"তুমি কি নার্সেস্ স্টেশনে যাওয়ার আগে লাঞ্চ করে নেবে? তাহলে একসঙ্গে ক্যাফেটেরিয়ায় যেতে পারি।"

হাতের ব্যাগ উঠিয়ে নিলাম—"চলো। রিসেপ্শন থেকে একটা রুম নাম্বারও জানতে হবে। একজন পেশেন্টকে দেখতে যাব।"

—"তোমার চেনা কেউ এখানে ভর্তি হয়েছে?"

—"চেনাশোনা কেউ নয়। ড. মহান্তি, অ্যানেসথেসিওলজিস্ট, তাঁর মাদার ইন্ ল। একবার দেখে আসি।"

লাঞ্চের পর সোফিয়া হসপিট্যালের ফার্মেসিতে গেল। ওষুদের সঙ্গে খাবারের ইন্টার অ্যাক্শন নিয়ে লেখা লিটারেচরগুলোর কারেন্ট কপি নিয়ে আসবে। আমি রিসেপ্শনে গিয়ে খোঁজ নিলাম। পেশেন্টের নাম জানি না। কাল রাতের অ্যাডমিশন লিস্ট থেকে একটা নাম পেলাম। শকুন্তলা মিশ্র। রুম ৩০৮। মহান্তির শাশুড়ির পদবি মিশ্র হতে পারে। দেখা তো করে আসি।

তিন তলায় নার্সেস্ স্টেশনে কথা বলার পর ৩০৮ নম্বর ঘরে ঢুকলাম। সেমি প্রাইভেট রুমে দু'জন রুগী। সামনের দিকের বিছানায় সেই আমেরিকান বুড়িই আছেন। নাকে অক্সিজেন টিউব। ওপাশে জানলার ধারে বিছানায় পায়ের দিকটা দেখতে পাচ্ছি।

আগে বুড়ির খবর নিলাম—"হাউ আর ইউ টু-ডে? আইসক্রিম আর কুকির ট্রলি এসেছিল?"

হাতের রিমোটে টিভির আওয়াজ আরও কমিয়ে দিয়ে বুড়ি খসখসে গলায় বললেন— "এখনো ট্রলি আসেনি। কাল আমাকে ফ্যাট-ফ্রি আইসক্রিম দিচ্ছিল। নিইনি। রেগিউল্যার ভেনেলা খেয়েছি। আই ডোন্ট হ্যাভ ব্যাড কোলেস্টেরল!"

—"আই নো। ডিনারে ক্যারামেল পুডিং খেতে পারো।"

—"ওহ্, আই লাভ দ্যাট!"

ডায়েটিশিয়ান হিসেবে খুনখুনে বুড়োবুড়িদের ওপর বেশি খবরদারি করি না। নব্বই বছর বয়সে একবাটি আইসক্রিম, কি কটা চকলেট কুকি খেলে কী আর হবে? ইনি নিউমোনিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। এবার বোধহয় বাড়ি যাওয়ার সময় হল।

পর্দার ওপাশে গেলাম। জানলার ধারে মোটামতো এক ভারতীয় মহিলা পিঠে বালিশ দিয়ে শুয়ে আছেন। মুখে অক্সিজেন মাস্ক্। ইন্ট্রা-ভেইনাস চলছে। আমাকে দেখে মাস্কটা সরালেন। একটু হাঁপাচ্ছেন।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—"কেমন আছেন? এখনও ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হচ্ছে?"

ওঁর কথার মধ্যে হাঁফ ধরছিল—"নট ওয়েল। বাট টু-ডে আই ফিল বেটার। অক্সিজেন ইজ হেল্পিং।"

মুখের কাছে মাস্ক্টা বসিয়ে দিলাম—"হাইডোজে স্টেরয়েড চলছে। ব্রংকো ডায়লেটার দিচ্ছে। দেখবেন হুইজিং গ্র্যাজুয়ালি কমে যাবে।"

শকুন্তলা যেন স্বস্তি পাচ্ছেন—"ইউ আর এ ডক্টর?"

—"না, না। আমি এই হসপিট্যালের ডায়েটিশিয়ান। ধ্রুব। ধ্রুব রয়।"

এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা হচ্ছিল। আমার নাম, পদবি জেনে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি বাঙালি? আমি বাংলা জানি।"

হেসে বললাম—"মু ওওড়িয়া বুঝি পারি। টিকে টিকে কহি পারি।"

আবার অক্সিজেন মাস্ক সরিয়ে দিলেন—"তমে ওওড়িয়া কহি পারো? কৌটি শিখিলে?"

—"ছোটবেলায় শিখেছিলাম। এখন প্রায় ভুলেই গেছি।"

শকুন্তলার সঙ্গে আমার আর গল্প করার সময় নেই। আধ ঘণ্টা পরেই হসপিট্যাল থেকে বেরিয়ে যাব। এর মধ্যে আইসক্রিম আর কুকির ট্রলি নিয়ে ভ্ল্যানটিয়ার মেরি অ্যান্ এল। বুড়িকে দেখলাম একমনে স্ট্রবেরি আইসক্রিম খাচ্ছেন। শকুন্তলা মিশ্র চা খেতে চাইছিলেন। নার্সদের বলে এই ফ্লোরের প্যানট্রি থেকে মাইক্রোওয়েভে চা করে নিয়ে এলাম। শকুন্তলা বলছিলেন বিকেলে ওঁর মেয়ে আসবে। ড. মহান্তি মাঝে দুবার ঘুরে গেছেন। আমি ওদের চিনি কি না জিজ্ঞেস করছিলেন। হাসপাতালের কাজের সূত্রে ড. মহান্তির সঙ্গে মুখচেনা। এখানকার অ্যানুয়্যাল ফান্ড রেইজিং ডিনারে বোধহয় ওঁর বউকেও দেখেছি। শকুন্তলা মিশ্রকে বলে এলাম অন্যদিন আবার আসব।

বাড়ি থেকে আসা যাওয়ার পথে একটা হলুদ বন পড়ে। বসন্তের শুরুতে অচেনা হলুদ ফুলে সারি সারি গাছগুলো ভরে ওঠে। সূর্যমুখীর মতো, দূরের সর্ষে ক্ষেতের মতো উজ্জ্বল হলুদ রং। বাতাসে পরাগরেণু ভাসে। আজ বাড়ি ফেরার পথে হলুদবনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হল নাখছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেই কো মনে...

শকুন্তলার নাকে হিরের ফুল। সুপ্রভা মাসীর মতো সুন্দর দেখাচ্ছে না। সুপ্রভা মাসী নাকছাবি পরতেন। আমার মা তখন কি স্টাইলিস। কালো জর্জেট, মেরুণ শিফন পরে সিনেমায় যায়। আর দিদি কিনা সুপ্রভা মাসীর মার কাছে গিয়ে নাক বিঁধিয়ে এল। মা সেদিন ওকে শুধু মারতে বাকি রেখেছিল।

দিদির নাকছাবি পরা হল না। সম্বলপুরে বিয়ে হল না। আমাদের উড়িষ্যা পর্ব হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। আজ ওড়িয়া বলতে গিয়ে দেখি ভাষাটাও ভুলে গেছি। শকুন্তলা অবশ্য বেশ ইমপ্রেস্‌ড।

বাড়ি ফিরে দেখি আমার দুই মেয়ে মধুরা আর নীরা ব্যালে স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। মধুরা প্রায় রেডি। নীরা তখনও জামাকাপড় পরা নিয়ে অ্যানেটের সঙ্গে তর্ক করছে। ছ বছর বয়সে সাজগোজ নিয়ে এত মতামত মধুরার ছিল না। নীরা অ্যানেট্‌কে দেখলে আরও বাড়ায়। এই জ্যামাইক্যান মহিলা ওকে

জন্ম থেকে দেখাশোনা করেছে। গত বছর পর্যন্ত ওকে ফুলটাইম রেখেছিলাম। নীরা ফার্স্টগ্রেডে যাওয়ার পর এখন আর অ্যানেটকে সারাদিন রাখি না। দরকার মতো ডাকি। এ সপ্তাহে মেয়েদের স্কুলে স্প্রিং ব্রেক চলছে। অ্যানেটও রোজ আসছে। মধুরা আর নীরাকে সুইমিং লেসন্ আর সকার প্র্যাক্‌টিসে নিয়ে যাচ্ছে। এখন আমি ব্যালে ক্লাসে নিয়ে যাব।

গাড়িতে উঠেই নীরা শুরু করল—"ব্যালের পরে ট্রেসী কি আমাদের বাড়ি আসতে পারে? ও চার্লিকে একবারও দ্যাখেনি।"

নতুন পাখিটাকে দেখানোর জন্যে নীরা প্রায়ই বন্ধু জুটিয়ে আনছে। মধুরা মাথা নাড়ল—"নট টু নাইট। আজ আমরা চাইনিজ খেতে যাব।"

নীরা দমে যাবার পাত্রী নয়—"শী ক্যান্ হ্যাভ চাইনিজ ফুড।"

আমার খেয়াল ছিল না। সুরঞ্জন কাল বলছিল নর্থরীজে একটা নতুন ইন্ডিয়ান-চাইনিজ খুলেছে। মেয়েদের ছুটির মধ্যে একদিন খেতে গেলে হয়। মধুরা আজকেই যেতে চাইছে শুনে বললাম—"তাহলে বাবাকে ফোনে বলে দে। নয়তো সময়মতো অফিস থেকে উঠবে না।"

মধুরা আমার সেলফোন নিয়ে সুরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলছিল। নীরা তখনও নাকি সুরে অ্যাপিল করে যাচ্ছে—"ক্যান ট্রেসী কাম উইথ আস্?"

আমরা কানে নিচ্ছি না দেখে মধুরার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে সুরঞ্জনকে রাজি করাল। শেষে আমি বোঝালাম—"আজ

নয়। আরেক দিন ট্রেসীকে ডিনারে নিয়ে যাব। চাইনিজ ফুড ইজ টু-উ স্পাইসি।"

—"আই নো। কলকাতায় চাইনিজ খেয়ে পেটে কি ক্র্যাম্পস হল। মধু তো টয়লেটে বসে কাঁদছিল।"

—"স্টপ ইট। আমরা আজ চাইনিজেই যাব। আর, ট্রেসীকে নেব না।"

—"আমরা কাল ম্যাকারনি অ্যান্ড গ্রিলে যাব। তোকে নেব না। রাইট, মা?"

মধুরা হাসছে দেখে নীরা হঠাৎ ভাঁড়ামি শুরু করল।

—"ইউ লাইক ফ্রারাস্? ইউ লাইক হাসাওয়ার স্যূপ্?" একবার বস্টনের চায়না টাউনে বুড়ো ওয়েটার ফ্রায়েডরাইস আর হট অ্যান্ড সাওয়ার স্যুপ্ নিয়ে এসে ফ্রারাস্, হাস্সাওয়ার স্যূপ বলেছিল। সেই থেকে মধুরা মজা করে সেটা বলে। এখন ছোটটাও সমানে এক কথা বলে যাচ্ছে। ওদের বকরবকর শুনতে শুনতে ব্যালে স্কুলে পৌঁছে গেলাম।

রাতে নর্থরীজ থেকে ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরতে দশটা বেজে গেল। মধুরা, নীরা শুতে যাওয়ার পর সুরঞ্জন কিছুক্ষণ টিভি দেখল। আমি রান্নাঘরে টুকটাক কাজকর্ম সেরে নিলাম।

ঘুমোনোর আগে বই পড়ার অভ্যেস। সুরঞ্জন শীর্ষেন্দু মুখার্জির উপন্যাস সমগ্র নিয়ে শুয়েছে। আমি ঝুম্পা লাহিড়ির 'আন অ্যাকাস্টম্ড্ আর্থ' বইটা সবে শেষ করেছি। আজ আর কিছু পড়তে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কাল ছুটি নিলে হত। সিক্ কল্ দিলে হয়। আসলে মেয়েদের অসুখ-বিসুখের কথা

ভেবে যখন তখন ছুটি নিতে চাই না। নীরা মাঝে মাঝেই জ্বরে পড়ে। তখন তো কাজে যেতে পারি না। কাল আর ডুব মারব না। সোয়া তিনটেয় তো ফিরেই আসি।

খানিক এপাশ ওপাশ করে সুরঞ্জনকে বললাম—"আর কতক্ষণ পড়বে? সাড়ে এগারোটা বাজে।"

—"আর পাঁচ মিনিট। 'যাও পাখি' আবার পড়ছি। অসাধারণ লেখা।"

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ ঘুম এল না। একেক রাতে কী যে হয়? অথচ কোনো কিছু নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করছি, এমন নয়। সংসার, চাকরি কোথাও সেরকম চাপের মধ্যে যাবি না। তবু মাঝে মাঝে অসংলগ্ন ভাবনায় নির্ঘুম রাত কেটে যায়। আজ যেমন বুরলার বাড়িটার কথা মনে পড়ছে। কাছে কৃষ্ণমন্দির ছিল। ভোরবেলা মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসত। তখনো বাইরে গাঢ় অন্ধকার। দূরের শালবন, পাহাড়ের মাথায় সূর্যের লাল আলো এসে পড়লে আমাদের সকাল হত। ছাদের ট্যাংক থেকে উঠোনে জল পড়ার ঝরঝর শব্দ। বাগানে মোরগের ডাক। ঘরের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছি। বাবার চটির খসখস আওয়াজ। রেগুলেটর ঘুরিয়ে পাখার স্পিড কমিয়ে দিলেন। তারপরেই মার ডাকাডাকি—উঠে পড়ো, উঠে পড়ো।

সেই প্রগাঢ় ঘুম কোথায় গেল? এই যে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে আছি, এও যেন অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। মার রূপ, গুণ কিছু তো

পেলাম না। দুটো/একটা রোগ পেয়েছি। এবার ইনসমনিয়াও এল বোধহয়।

শকুন্তলা মিশ্র এক সপ্তাহের ওপর হাসপাতালে থাকলেন। মাঝে মাঝে দেখে আসছিলাম। খাওয়া নিয়ে ওঁর বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। অ্যামেরিকান রান্না খেতেই পারেন না। যেটাই সাজেস্ট করি, নাক কুঁচকে বলেন—গন্ধ লাগে। কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নেই। অনেক হাসপাতালে এশিয়ান পেশেন্টদের ওরিয়েন্টাল ফুড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু নিউইংল্যান্ডের এই ছোট হাসপাতালে অল্ আমেরিকান ফুড-ই চলছে। ভেজিটেরিয়ান, মাছের ডিশ সবই দেয়। তবে অভ্যেস না থাকলে খেতে ইচ্ছে করে না। দুদিন দেখে আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে শকুন্তলার জন্যে হোম ফুড রেকমেন্ড করিয়েছিলাম। ওঁর মেয়ে অনুরাধা বাড়ির রান্না নিয়ে আসছিল। ব্যবস্থাটা ড. মহান্তিও করতে পারতেন। দেখলাম আমার কাজটা আমার কাছেই আশা করছিলেন। শকুন্তলা বাড়ি যাওয়ার দিন অনুরাধা নার্সেস্ স্টেশনে কয়েক বাক্স ডান্কিন ডোনাট নিয়ে এসেছিল। নার্সরা রসিকতা করে বলল, ডোনাট খেতে পারি, যদি মিসেস মিশ্র হসপিট্যালের বেক্‌ড চিকেন খান। উনি হুইল চেয়ারে চড়ে যেতে যেতে বললেন—"আই ইনভাইট ইউ ফর ইন্ডিয়ান ফিশ-কর্নার।"

আমাদের শহরে নতুন হিন্দুমন্দির হয়েছে। মন্দির কমিটি থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পাঠায়। সারা বছরের পুজো পার্বণের খবর দেয়। যাব যাব করে এখনও যাওয়া হয়নি। এবার রথযাত্রার অনুষ্ঠানের খবর দিয়েছে। সুরঞ্জনকে বললাম—"চলো,

মেয়েদের জগন্নাথ দেখিয়ে আসি। এমনিতে তো যাওয়া হয় না। ঐ দিন উইক-এন্ড পড়েছে। বিকেলের দিকে ঘুরে আসব।"

সর্দারজির দোকান থেকে ফল, মিস্টি কিনে নিয়ে রথের দিন মন্দিরে গেলাম। বিরাট হল ঘরে মার্বেলের বেদির ওপর রাধাকৃষ্ণ, গণেশ, অম্বা, শিবলিঙ্গ, হনুমানজী সবাই আছেন। একেবারে সামনে জগন্নাথ। ভিড়ের মধ্যে একটা বাচ্চা চোখ ঢেকে কাঁদছে। জগন্নাথ দেখে ভয় পেয়েছে। তার দিদিটার দিকে তাকিয়ে দেখি অনিল সাহার মেয়ে। নীরার চেয়েও ছোট। শুনলাম ভাইকে অভয় দিচ্ছে, "জগন্নাথ ইজ্ মাকালীস্ ব্রাদার। দে অলমোস্ট লুক দ্য সেম্।"

পেছনের হাসির শব্দ শুনে ঘুরে দেখলাম অনিল সাহাদের সঙ্গে ডঃ মহান্তিরা সপরিবারে দাঁড়িয়ে আছেন। অনিলের বউ রত্না বলল—"ওরা মাকালী, দুর্গাঠাকুর চেনে। জগন্নাথ তো আগে দেখেনি।"

শকুন্তলা হেসে বললেন—"জগন্নাথের মহিমা শিশুকালে কে বুঝি পারে?"

অনিল সাহা ডঃ মহান্তিকে দেখিয়ে বললেন—"জগন্নাথকে তো উনিই পুরী থেকে আনিয়েছেন।"

ডঃ মহান্তি কিছু বলার আগেই অনুরাধা হাতজোড় করে বলল—"মহাপ্রভু নিজের ইচ্ছায় এসেছেন।"

প্রসাদ নিয়ে আমরা যখন মন্দিরের পার্কিং লটে এলাম, মহান্তিরা তখন গাড়িতে উঠছেন। অনুরাধা জিজ্ঞেস করল—"আপনারা কোথায় থাকেন?"

—"কাছেই। নর্থ স্ট্যামফোর্ডে। আপনারা?"

—"ড্যারিয়েন-এ। আপনাদের একদিন বাড়িতে ডাকব। মা ইন্ডিয়া যাওয়ার আগে একটা ডেট ঠিক করব।"

আমাদের কথাবার্তা ইংরেজিতেই হচ্ছিল। শকুন্তলা ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমার মেয়েদের নাম টাম জিজ্ঞেস করছিলেন। অনুরাধার সঙ্গে ওর ছেলে এসেছে। মেয়ে বাড়িতে আছে। ফোর্থ গ্রেডে পড়ে মানে মধুরার বয়সী। ছেলেটা নীরার চেয়ে ছোট।

ডঃ মহান্তি সুরঞ্জনকে বললেন—"ধ্রুবা শুনলাম ফ্লুয়েন্ট ওওড়িয়া বলেন। আপনিও কি ওড়িশায় ছিলেন?"

—"না, না। আমরা কলকাতার। ইন্ ফ্যাক্ট্ ধ্রুবারাও খুব বেশি দিন উড়িষ্যায় ছিল না। ও তো বলে ওড়িয়া ভুলে গেছে।"

ডঃ মহান্তি বললেন—"আমরাই মাতৃভাষা ভুলে গেছি। ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, এখানে ওওড়িয়া কমিউনিটিতেই অনেকে ওওড়িয়া বলে না। হাউ স্ট্রেঞ্জ!"

সপ্তাহ দুই বাদে অনুরাধার ফোন এল। কদিন আগে পড়ে গিয়ে শকুন্তলার বুকের রিব ভেঙেছে। হাঁটুর লিগ্যামেন্ট ছিঁড়েছে। মাকে নিয়ে ও এত ব্যস্ত ছিল যে, আমাকে ফোন করতে পারেনি।

জিজ্ঞেস করলাম—"কবে হল? মিসেস মিশ্র কি হসপিট্যালে এসেছিলেন?"

—"না, সোজা অর্থোপেডিকের কাছে নিয়ে গেলাম। রিব ফ্র্যাক্‌চারে তো ন্যাচ্‌র্যাল হীলিং প্রসেস্‌ ছাড়া কোনো ট্রিটমেন্টও নেই। রোজ পেইন মেডিকেশন দিতে হচ্ছে। এরপর হাঁটুতে ফিজিওথেরাপি হবে। শি ইজ সাফারিং এ লট্‌।"

—"আই রিয়েলি ফিল ব্যাড! বাট হাউ ডিড ইট হ্যাপ্‌ন্‌?"

—"বেসমেন্টে নামতে গিয়ে জুতোর সঙ্গে শাড়ি জড়িয়ে পড়ে গেলেন। অতগুলো স্টেপ! হেড ইনজুরি হতে পারত।

—"সত্যি! অ্যাকসিডেন্ট যে কীভাবে হয়। অনুরাধা, যদি কোনো দরকার হয় আমাকে বলতে পারো।"

—"থ্যাংক ইউ ধ্রুবা। তোমাদের একদিন ইনভাইট করব ভাবলাম। এমন সিচ্যুয়েশন হল..."

—"এরকম তো হতেই পারে। ইনডিটেশনের কিছু নেই। আমি নিজেই একদিন মিসেস মিশ্রর কাছে যাব।"

জুনের শেষে মেয়েদের গরমের ছুটি হবে। দু সপ্তাহের জন্যে ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা, অ্যারিজোনা বেড়াতে যাব। ভাবলাম তার আগে মহান্তিদের বাড়ি ঘুরে আসব। হসপিট্যালে এর মধ্যে ডঃ মহান্তিকে একদিন দেখলাম। মনে হল খুব ব্যস্ত। কথা হল না।

সকালের দিকে খবরের কাগজ পড়ার সময় থাকে না। তাও "নিউইয়র্ক টাইমস্‌" এর হেডলাইনগুলো দেখে নিই। আর একটা কাগজ আসে স্ট্যামফোর্ড অ্যাডভোকেট।" কানেটিকাটের এই অঞ্চলের খবরই বেশি থাকে। বাড়ি ফিরে ঐ কাগজটা পড়ি। আজ একটা খবর বেরিয়েছে। এ ম্যান হ্যাজ বিন অ্যাকিউজড্‌ ফর মলেস্টেশন...।

লিখেছে—"বাহাত্তর বছর বয়সী মাধব মিশ্র ড্যারিয়েনে এগার বছরের মেয়েকে যৌন আক্রমণের চেষ্টা করায় পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে। মেয়েটি মিশ্রদের বাড়িতে তার বন্ধুর কাছে গিয়েছিল। কোনো সুযোগে মাধব তাকে বিশ্রীভাবে স্পর্শ করায় মেয়েটি বাড়ি ফিরে তার মাকে ঘটনাটা জানায়। তাদের অভিযোগে পুলিশ মাধব মিশ্রকে অ্যারেস্ট করায়, সে অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দুদিন পরে 'মিশ্র ফ্যামিলি' বেইল্ দিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটির মা, বাবার পক্ষ থেকে তাদের উকিল মাধব মিশ্রর বিরুদ্ধে মলেস্টেশন চার্জ ফাইল করেছে। মিশ্রর উকিল এখনো কেস সম্পর্কে রিপোর্টারদের কোনো স্টেটমেন্ট দেয়নি। বিচারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মাধব মিশ্রকে নিরপরাধ বলে ধরা হচ্ছে।"

কি কাণ্ড! একজন ইন্ডিয়ান বুড়ো শেষে মলেস্টেশন চার্জে পড়ল! 'স্ট্যামফোর্ড অ্যাডভোকেটে' লিখেছে এটা ড্যারিয়েনের ঘটনা। মহান্তিরা তো ওখানে থাকে। হয়ত লোকটাকে চিনতেও পারে। মাধব নামটা শুনলে একটা বাজে লোকের কথা মনে হয়। এরও দেখছি একই প্রবৃত্তি! যদি সত্যি কিছু করে থাকে, ওর জেল হওয়া উচিত। এদেশে বদমাইশি করে পার পাওয়া অত সোজা নয়। ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাচিং প্রমাণ করতে পারলেই হল। আর আমরা ছোটবেলায় ভয়ে কিছু বলতেই পারতাম না। বাসের ভীড়ে, সিনেমা হলে ঢোকার মুখে, নোংরা হাতের চোরা আক্রমণের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। চেনা লোকেরাও সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। দিদির সাহস ছিল বলে রুখে

দাঁড়িয়েছিল। যার জন্যে কষ্টও কম পেল না। এখন মনে হয় ভালোই হয়েছে...।

খবরের কাগজ হাতে আকাশ পাতাল ভাবছি, হঠাৎ মনে হল অনুরাধাকে ফোন করব বলেছিলাম। সাত কাজে ভুলেই গেছি। ওর মাকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

মহান্তিদের ফোন বেজেই যাচ্ছে। ওদের অ্যান্সারিং মেশিনে যখন মেসেজ্ রাখছি, মাঝপথে অনুরাধা ফোন ধরল। ওর মার খবর নেওয়ার পর বললাম—"কাল যদি হসপিট্যাল থেকে ফিরে তোমাদের বাড়ি যাই, তুমি কি থাকবে?"

একটু ইতস্তত করে ও উত্তর দিল—"আমার অফিস থেকে ফিরতে পাঁচটা বাজে। ক্যান ইউ কাম অ্যারাউন্ড ফাইভ-থার্টি?"

—"ঠিক আছে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে যাব। সুরঞ্জন ওয়াশিংটন গেছে। কাল ওর ফিরতে রাত হবে। আমি মেয়েদের নিয়ে ঘুরে আসব।"

—"ধ্রুবা, আমার মেয়ের শরীরটা ভালো নেই। তোমার মেয়েরা এলে ও ঠিক কম্পানি দিতে পারবে না। আই হোপ ইউ ওন্ট মাইন্ড..."

—"ইট্স ও. কে। আমি একাই আসব।"

ফোন রেখে নিজের ওপরেই রাগ হল। কেন গায়ে পড়ে যেতে চাইলাম? কি এমন চেনাশোনা যে, ভদ্রতা না করলে নয়। অনুরাধার কথার মধ্যে কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। মেয়েদের নিয়ে যেতে বারণ করল। ওরা কি ছোট বাচ্চা যে লোকের বাড়ি গিয়ে

হুড়োহুড়ি করবে? মিসেস মিশ্রও এমন কিছু সিরিয়াসলি অসুস্থ নন। এখন মনে হচ্ছে না-গেলেই হয়। বিকেলবেলা মেয়ে দুটোকে কার কাছে রেখে যাব? দেড়/দু ঘণ্টার জন্যে অ্যানেটকে ডাকা মানে তিরিশ ডলার বেরিয়ে যাবে। কোনো মানে হয়?

শেষ পর্যন্ত পাশের বাড়ির ক্যারোলিনের সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের দু বাড়ির মধ্যে অনেকদিনের চেনাশোনা। ক্যারোলিনের চার ছেলে মেয়ের মধ্যে ছোট দুজন মধুরা, নীরার বন্ধু। ক্যারোলিন বলল কাল ওর ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই মধুরারা ডিনার খেয়ে নেবে। বাড়ি ফেরার জন্যে আমার তাড়া করার কিছু নেই। ওকে বললাম—"অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাচ্ছি। বেশিক্ষণ থাকব না।"

পরদিন সন্ধে ছটা নাগাদ ড্যারিয়েনে পৌঁছোলাম। মাঝে একবার ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। পথে ফুলের দোকানে নেমে ফুল কিনতেও দশ মিনিট। মহান্তিদের বিশাল বাড়ির ড্রাইভ ওয়েতে গাড়ি রেখে যখন ডোরবেল দিতে যাচ্ছি, অনুরাধা দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল—"ডিরেক্‌শন ঠিক ছিল? এসো, ভেতরে এসো।"

ওর হাতে ফুলের তোড়াটা দিয়ে বললাম—সরি, একটু দেরী হয়ে গেল। এক্‌সিট ঠিকমতোই নিয়েছিলাম। পরে একটা ভুল টার্ন নিয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম।"

—"প্রিটি ফ্লাওয়ার্স। থ্যাংক ইউ। চলো ফ্যামিলি রুমে গিয়ে বসি।"

ফ্যামিলি রুমে বসে কফি খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। বাড়িতে অন্য কারুর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। একসময় দেখলাম ওর ছেলে-মেয়েরা কিচেনের দিকে গেল।

অনুরাধা উঠে দাঁড়াল—"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ওদের ডিনারটা রেডি করে দিয়ে আসি।"

—"সিয়োর! তুমি ওদের খেতে দিয়ে এস। আসলে আমি একটু অড্ আওয়ারে এসেছি। সুরঞ্জন নেই বলে ভাবলাম আজ বিকেলে সময় আছে।"

—"আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ধ্রুবা। তুমি জাস্ট দু মিনিট অপেক্ষা করো।"

অনুরাধা কিচেনে গেল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মিসেস মিশ্রকে দেখতে পাইনি। বোধহয় ওপরে বেডরুমে আছেন। আমি আর বেশিক্ষণ বসব না। দেখি, অনুরাধা কখন ওর মার কাছে নিয়ে যায়। এত অল্প আলাপে হুটহাট করে দোতলায় যাওয়া যায় না। অথচ ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখতেই আসা। না হলে কাল আমি সোজা কাটিয়ে দিতাম। অনুরাধা কাল বলল ওর মেয়ের নাকি শরীর ভাল নেই। মধুরাদের আনতে বারণ করল। আজ তো দেখলাম মেয়েটা দিব্যি সুস্থ। খেতেও বসে গেছে।

অনুরাধা ফিরে এল। এবার নিজে থেকেই বলল—"চলো, মার ঘরে যাই। এখনো তো নীচে নামতে পারছেন না। নেক্সট্ উইক থেকে ফিজিওথেরাপি হবে। তখন নীচের বেডরুমে নিয়ে আসব।"

দোতলার গেস্টরুমে শকুন্তলা বিছানায় আধশোয়া হয়ে কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে কাগজটা কোলের ওপর রেখে শুধু বললেন—"এসো।" চেহারাটা এই কদিনে আরও খারাপ দেখাচ্ছে। রুক্ষ রুক্ষ চুল, চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। পড়ে গিয়ে রিব ফ্র্যাক্চার মানে যন্ত্রণাতেই কাহিল করেছে। তার ওপর হাঁটুর ব্যথায় চলতে পারছেন না। দেখে খারাপ লাগছিল।

অনুরাধা একটা চেয়ার এনে বলল—"এখানে বসো। তুমি যে আজ সময় করে মার সঙ্গে দেখা করতে এলে। হস্‌পিট্যালেও মাকে কম্পানি দিয়েছ। দ্যাট্‌স রিয়েলি নাইস্ অফ্ ইউ।"

আমি শকুন্তলাকে জিজ্ঞেস করলাম—"এখন কেমন আছেন? যন্ত্রণা একটু কমেছে?"

শকুন্তলা বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন—"সব আমার ভাগ্য। নিজের কষ্ট, মেয়ে জামাই-এর দুর্ভোগ। এবার কেন যে এখানে এলাম।"

—"অ্যাকসিডেন্ট তো এভাবেই হয়। তবু যে আরো সিভিয়র ইন্‌জুরি হয়নি।"

—"হলে ভালো হত। একেবারে মরে যেতাম। জ্বালা যন্ত্রণা শেষ হত।"

শকুন্তলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কের মতো জানলার বাইরে চেয়ে আছেন। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত নীরবতা। অনুরাধা মাকে একটা কথাও বলল না। শকুন্তলাকে মনে হচ্ছে খুবই ডিপ্‌প্রেস্‌ড। শুধু কি অসুস্থতার জন্যে? ওঁর কথার মধ্যে কোথায় যেন ক্ষোভ লুকিয়ে আছে।

বাইরে সন্ধে হয়ে আসছে। অনুরাধা উঠে ঘরের বাকি আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল। শকুন্তলা চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার মেয়েরা ভালো আছে?"

—"এখন ভালো আছে। মাঝে ছোট মেয়ে কদিন জ্বরে ভুগল।"

—"তুমি কত দূরে থাকো, ঐ মন্দিরের কাছাকাছি?"

—"না। আপনাদের এখানে আসতে যা সময় লাগল, ঐ রকমই ডিসটেন্স। আধঘণ্টার ড্রাইভ।"

এতক্ষণ পরে অনুরাধা জিজ্ঞেস করল—"তোমার বোধহয় হস্‌পিট্যালটা কাছে পড়ে?"

—"খুবই কাছে। মেয়েরা স্কুল থেকে ফেরার আগেই বাড়ি চলে আসি।"

চেস্ট্ অফ ড্রয়ার-এর মাথায় রাখা ঘড়িটায় পৌনে সাতটা বাজে। এবার ওঠা উচিত। অনুরাধার ব্যবহার এতই নিরুচ্ছ্বাস যে, আর কথা বাড়ানোর মানে হয় না। হয়ত সত্যিই অসময়ে এসে পড়েছি। শকুন্তলাকে বললাম—"এবার আমি উঠি। মেয়েদের নেবারের বাড়ি রেখে এসেছি। আমার হাজবেন্ডও আজ রাতের ফ্লাইটে ফিরছে। আপনাদেরও তো ডিনারের সময় হল।"

অনুরাধা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল—"মা রাত নটার আগে খাবেন না। দেশের অভ্যেস। এখন অবশ্য জয়দেব বকাবকি করায় একটু আগে খেয়ে নিচ্ছেন।"

ড্রাইভ ওয়েতে পৌঁছে দেখি ওদের গ্যারাজের দরজা খোলা।

ডঃ মহান্তি গাড়ি থেকে নেমে আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। ওপাশের দরজা খুলে বয়স্ক মতো এক ভদ্রলোক আমাকে দেখছেন। তারপরেই গ্যারাজের ভেতরের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

—"হ্যালো ধ্রুবা, হাউ আর ইউ? কখন এসেছিলেন?"

—"অ্যারাউন্ড সিক্স ও ক্লক। মিসেস মিশ্রর খবর পেয়ে নিজেই ফোন করে চলে এলাম। দেখে খারাপ লাগল। আশাকরি ভালোভাবে রিকভার করে যাবেন।"

—"কোনোটাই তো লাইফ থ্রেটনিং ইন্‌জুরি নয়। তবে রিকভার করতে সময় নেবে। হাঁটুর ব্যথা পুরোপুরি যাবেও না।"

ডঃ মহান্তির সঙ্গে কথা শেষ করে গাড়িতে উঠে খেয়াল হল আমার হ্যান্ডব্যাগ ফেলে এসেছি। বোধহয় ওদের ফ্যামিলি রুমে পড়ে আছে। দোতলায় নিয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে না।

আবার ফিরে যেতে হল। ডঃ মহান্তি তখনো গ্যারাজ ডোর বন্ধ করেননি। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—"হাইওয়ের ডিরেক্‌শানটা দরকার?"

আমি ব্যাগ ফেলে এসেছি শুনে গ্যারাজের ভেতর দিয়েই বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রান্নাঘর পার হয়ে ফ্যামিলি রুমে ঢোকার মুখে অনুরাধার সঙ্গে দেখা। বললাম—"আমার পকেটবুকটা ফেলে গেছি। বোধহয় কফি টেবলের নীচে রেখেছিলাম।"

বলতে বলতে নিজেই ব্যাগটা দেখতে পেয়ে ঘরে ঢুকেছি সেই লোকটি দেখলাম সোফায় বসে আছে। ফর্সা, রোগাটে চেহারা।

খাড়া নাকের নীচে পুরু ঠোঁট। মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে। চশমার আড়ালে আমাকে লক্ষ্য করছিল। চোখে চোখ পড়তেই মুখটা ঘুরিয়ে টিভি দেখতে লাগল।

অনুরাধা ব্যস্ত হয়ে উঠল—"ধ্রুবা চলো, গ্যারাজ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।"

আমি জানি আমার সঙ্গে কেউ এই লোকটার আলাপ করিয়ে দেবে না। বুঝতে পারছি আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা এরা পছন্দ করছে না। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে পড়ুক। ফিরতে দেরি হয় হোক। তবু লোকটাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব এত বছর পরেও ওকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

ডঃ মহান্তিকে বললাম—"ইউ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। একসময় চিনতাম বলে মনে হচ্ছে।"

ডঃ মহান্তি থতমত খেয়ে বললেন—"ও, আচ্ছা! উনি বোধহয় আপনাকে চিনতে পারেননি।"

অনুরাধার মেয়ে এসে বলল ওর দিদিমা কি একটা ওষুধ চাইছেন। দাদুকে ওপরে ডাকছেন। অনুরাধা কিছু বলার আগেই লোকটা সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল।

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি কি মাধব মিশ্র? তুরলায় থাকতেন?"

লোকটা না চেনার ভান করল—"এক সময় ওখানে ছিলাম। কবে কার কথা! আজকাল অনেক কিছুই ভুলে যাই।"

—"আমাকেও বোধহয় চিনতে পারছেন না? আমরা সুপ্রভামাসীদের পাশের বাংলোয় থাকতাম। আপনি তো উদয়নের মামা? আমার দিদির নাম ইন্দিরা।"

লোকটা বেশ রূঢ়ভাবে জবাব দিল—"না। আমার ঠিক মনে পড়ছে না। দেখি, আমাকে এবার ওপরে যেতে হবে।"

চলে আসার সময় মহান্তিদের অপ্রসন্ন মুখ দেখে বলে এলাম—"সরি, আপনাদের দেরি করিয়ে দিলাম। ব্যাগ নিতে এসে মাধব মিশ্রকে দেখে অবাক হয়ে গেছি। ছোটবেলায় আমাদের বুরলার বাড়িতে উনি আসতেন। এনি ওয়ে, গুডনাইট।"

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে উঠলাম। মাথার ভেতর ভীষণ উত্তেজনা! তারই মধ্যে মেয়েদের ফোন করে বললাম আধ ঘণ্টা পরে চলে আসছি। বেশ বৃষ্টি পড়ছে। সুরঞ্জনের প্লেন সময় মতো এলে হয়।"

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হাইওয়ে ধরে ফিরছি। উইন্ডস্ক্রিনে ওয়াইপারের ঘটঘট আওয়াজ। সিডিতে রশিদের ঠুম্‌রি। সব শব্দ ছাপিয়ে আবার নিজের কথাটাই শুনতে পাচ্ছি—আপনি মাধব মিশ্র? আশ্চর্য! পদবিটা কী করে মনে পড়ল। তিরিশ বছরেরও আগে চিনতাম। তখন আমার বারো বছর বয়স। উদয়নের মাধবমামার পদবিটা সত্যিই কি মনে থাকার কথা? অথচ আজ হঠাৎ স্মৃতি থেকে উঠে এল।

পুরনো ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে বাড়ির কাছাকাছি চলে

এসেছি। হঠাৎ খেয়াল হল মাধব মিশ্র নামটা কদিন আগে কোথায় যেন শুনেছি। নাকি কোথাও পড়লাম? তখনই 'স্ট্যামফোর্ড অ্যাডভোকেটে' চাইল্ড মলেস্টেশনের খবরটা মনে পড়ল। ইন্ডিয়ান লোকটার কী নাম ছিল? মাধব মিশ্র না? ভাগ্যিস মধুরাদের সঙ্গে নিয়ে যাইনি। নোংরা লোকটার ধারেকাছেও ওদের যেতে দেব না। মহান্তিদের সঙ্গে মেলামেশা এই শেষ।

সুরঞ্জন বাড়ি এল রাত এগারোটার পরে। মেয়েরা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল শনিবার। অফিস নেই। শুতে যাওয়ার আগে সুরঞ্জন নীচে বসে গত কয়েকদিনের চিঠিপত্রগুলো দেখছিল। খবরের কাগজটার ক্রাইম রিপোর্টের পাতা খুলে ওকে বললাম— "এটা পড়ে দ্যাখো। তারপর তোমাকে একটা কথা বলব।"

খবরটা পড়ে সুরঞ্জন বলল—"সেক্স্যুয়্যাল পারভারশন আর কাকে বলে! লোকটা তো দেখছি ইন্ডিয়ান। গিলটি প্রমাণ করতে পারলে জেল হবে। যত সব কুসন্তান!"

—"লোকটা কে বলো তো? ভাবতেও পারবে না।"

—"কে আবার? এ সব ডার্টি ওল্ডম্যানদের আমি চিনি না। তুমি চেনো?"

ওর ঠাট্টার উত্তরে বললাম—"এই লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। কে জানো সুরঞ্জন? বুরলার সেই মাধব মিশ্র। বুঝতে পারছ কার কথা বলছি? আমাদের ছোটবেলার সেই জঘন্য পারভার্ট লোকটা।"

সুরঞ্জন অবাক—"সেই ওড়িয়া লোকটা? এতবছর বাদে এখানে? আর ইউ কিডিং?"

—"ইয়েস। দ্যাট গাই ইজ হিয়ার। আই মেট্ হিম টু-ডে।"

সুরঞ্জনের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না—"কোথায় দেখলে? সে তো বেইল পেয়ে চলে গেছে। ধ্রুবা, আর ইউ শিয়োর, দিস্ ইজ দ্যা সেম্ গাই?"

—"না দেখলে জানতেও পারতাম না। নিউজে নামটা দেখে খেয়াল করিনি। আজ ডঃ মহান্তির বাড়ি গিয়েছিলাম। ওঁর শাশুড়ি হঠাৎ পড়ে গেছেন। ওঁকে দেখতে গিয়ে মনে হল, ওদের বাড়িতে বোধহয় কোনো টেনশন চলছে। অনুরাধা, ওর মা দুজনেই যেন বেশ ডিস্টার্বড। চলে আসার সময় হঠাৎ একজন বুড়ো মতো লোককে দেখলাম। কিরকম সন্দেহ হল। এত বছর পরেও চেহারাটা মনে আছে। এ নিশ্চয়ই বুরলার সেই লোকটা? সুপ্রভামাসীর ভাই মাধব।"

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করল—"তোমাকে চিনতে পারল? তুমি বোধহয় কথাটথা বলোনি?"

—"ইচ্ছে করেই কথা বললাম। দেখছিলাম কি রি-অ্যাক্শন হয়। অ্যাজ ইউশুয়্যাল, না চেনার ভান করল। ওর নাকি আমাদের কথা কিছু মনেই পড়ছে না। সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার, মহান্তিরা একবারও ওর পরিচয়টা দিল না।"

—"লোকটা কে? ওদের আত্মীয়? ওরা তাহলে খুব ঝামেলায় পড়ে গেছে।"

—"সুরঞ্জন, পঁচিশ হাজার ডলার বেইল দিয়ে কাকে ওরা রিলিজ করিয়ে এনেছে বুঝতে পারছ না?"

সুরঞ্জন হাই তুলল—"ঐ তো, মাধব মহান্তিকে।"

—"দূর! তুমি কিচ্ছু শুনছ না। মাধব মহান্তি নয়, মাধব মিশ্র। লোকটা কে জানো? অনুরাধার বাবা। শকুন্তলা মিশ্রর হাসবেন্ড।"

—"মাই গড। একটা ফ্যামিলির কি প্রচণ্ড হিউমিলিয়েশন? ধ্রুবা, তোমার ওদের বাড়ি যাওয়া উচিত হয়নি। ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছে তুমি জেনেশুনেই গেছ।"

আমি রেগে উঠলাম—"মোটেই না। আমি কী করে জানব যে অনুরাধার বাবা এখানে আছে? সে যে মাধব মিশ্র, তাই বা জানব কী করে? কাগজে নামটা দেখেও মনে হয়নি। ইন ফ্যাক্ট্ ওদের বাড়িতে গিয়ে ভাবতেও পারিনি, ড্যারিয়েনের এই বুড়োটাকেই পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল। যখন বাড়ি ফিরছি হঠাৎ খেয়াল হল ঐ নামটাই তো স্ট্যামফোর্ড অ্যাডভোকেট এ বেরিয়েছে। তখন রিয়েলাইজ করলাম, কেন ওরা সবাই এত টেনস্‌ড।"

সুরঞ্জন সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল—"সবই বুঝলাম। কিন্তু, এ সবের মধ্যে থেকো না। ডঃ মহান্তি তোমাদের হসপিট্যালে আছেন। আই ডোন্ট থিংক, ইউ শ্যুড ডিস্‌কাস দিজ থিংগস্ উইথ এনিবডি।"

দোতলায় ওঠার আগে বললাম—"কাকে আর বলতে যাব। মহান্তিদের জন্যে খারাপও লাগছে। কিন্তু লোকটার শাস্তি হওয়া দরকার। সুপিরিয়র কোর্টে কেস উঠলে একদিন যাব।"

কথাটা সুরঞ্জনের ভালো লাগেনি। পরে বিছানায় শুয়ে বলল—"আমিও চাই মাধব মিশ্রর শাস্তি হোক। তা বলে, তোমার কোর্টে যাওয়ার কী দরকার? হয়ত কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। লোকটা শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যাবে। মাঝখান থেকে মহান্তিদের সঙ্গে একটা মিস্‌আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে।"

—"কিন্তু মেয়েটা যা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, প্রসিকিউটর তা এস্‌ট্যাব্‌লিশ করতে পারবে না?"

ঘুমজড়ানো গলায় সুরঞ্জন উত্তর দিল—"ডিফিকাল্ট্‌। অসভ্যতা তো কেউ সাক্ষী রেখে করে না। মেয়েটার কথাগুলো ডিফেন্স থেকে মিথ্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে। রেপ্‌চার্জ তো নয়, যে ফিজিক্যাল এভিডেন্স, মেডিকেল রিপোর্ট টিপোর্ট থাকবে... যাক গে, ঘুমোনোর চেষ্টা করো।"

শেষ রাতে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রলয় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলার কাচে বিদ্যুতের তীব্র আলো। মেয়েদের ঘরে জানলা বন্ধ করতে গেলাম। নীরার ঘরে ঢুকে দেখি মেঘ ডাকার আওয়াজে জেগে উঠেছে। ঘুম চোখে বিড়বিড় করে বলল—"ভয় করছে। তোমার কাছে শোব।"

শোবার ঘর থেকে বালিশ এনে ওর পাশে গিয়ে শুয়েছি। নীরা আমার গা ঘেঁসে গুটিশুটি মেরে তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। ছাদের ওপর জল পড়ার ঝরঝর শব্দ শুনতে শুনতে অন্ধকার ঘরে নীরাকে জড়িয়ে শুয়ে আছি। ওর নরম শরীরে এখনো শৈশবের অমল গন্ধ। এই সুরক্ষিত জীবনে কোনো আতঙ্কের ছায়া যেন

ওকে ঘিরে না ধরে। মধুরা, নীরাকে দেখি আর হঠাৎ করে সারুর মুখটা মনে পড়ে যায়। সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি, অসহায় কান্না। এতবছর পরেও বুরলার স্মৃতি আমাকে তাড়া করে ফেরে। ঐ বয়সেই মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছিল। সুরঞ্জন বলে আমার সাইকোলজিক্যাল কাউনসেলিং দরকার ছিল। হয়ত ছিল। তবু, ঐ অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে। সতর্কতা শিখিয়েছে। ভবিষ্যতে রুখে দাঁড়ানোর সাহস দিয়েছে। সেই সাহসে ভর করে আর একবার কি মাধব মিশ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াব? কিন্তু সুরঞ্জন যা বলছিল, কোর্ট এভিডেন্স চায়। আমার তো সাক্ষী, প্রমাণ সব হারিয়ে গেছে। সারুকে কোথায় পাব?

সারুর কথা ভাবতে ভাবতে ওর বাবা ভ্রমরকে মনে পড়ল। সুপ্রভা মাসীদের বাড়ির মালি। ঢেন্‌কানলের লোক। ওদের আউট হাউসে থাকত। ওর প্রথম বউকে আমরা দেখিনি। সারু তার মেয়ে। সারুর মা মারা যেতে ভ্রমর আবার বিয়ে করেছিল। সেই বউ, বাচ্চারা, ঢেন্‌কানলে থাকত। সারুকে মাঝে মাঝে ভ্রমর নিজের কাছে নিয়ে আসত। ওর তখন কত বয়স? আট/ন বছর হবে। মাথায় তেল চপ্‌চপে ঢুলে বেড়াবিনুনি। আধময়লা ছিটের ফ্রক পরে উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। মা ওর নাম জিজ্ঞেস করায় চোখ নামিয়ে বলেছিল—"সরস্বতী জেনা।"

ভ্রমরকে নিয়ে বাড়িতে একটা মজার গল্প ছিল। ও মাঝে মাঝে সুপ্রভা মাসীদের বাগানের তরকারি দিয়ে যেত। বাবা একবর্ণ ওড়িয়া জানেন না। আমাদের উঠোনে খুব বেলফুল, জুঁই ফুল

ফুটেছিল। বাড়ির পেছনের ছোট গেটটা খোলা থাকলে গরু, ছাগল ঢুকে পড়ত। মা তাই বারবার গেট বন্ধ রাখতে বলতেন। একদিন বাবা দুপুরে অফিস থেকে খেতে এসেছেন। ভ্রমর একঝুড়ি তরকারি নিয়ে এল। ফেরার সময় যখন গেটের কাছে গেছে, মা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন—"ভ্রমর এবে নাউ ফলোনি?"

ভ্রমর মাথা নেড়ে গেট বন্ধ করে চলে গেল। বাবা বললেন—"আজ একটা সেনটেন্স শিখলাম। গেট বন্ধ করতে বলার ওড়িয়া হচ্ছে—"নাউ ফলোনি।"

আমরা হেসে গড়াগড়ি। মা যে ভ্রমরকে ওদের বাগানে লাউ হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাবা তার এই মানে বুঝেছেন। তারপর আমরা বাড়ির সামনে গেট খুললেই বাবা মজা করতেন—"অ্যা...ই...ই নাউ ফলোনি।"

কত ঘটনা যে মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে। মহানদী থেকে মহাসাগর পার হয়ে এসেছি। পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত থেকে কোথায়। উদয়ন, সুভদ্রা নানি, কুহু, বাবুদাদা, কারুর সঙ্গে আর দেখা হল না। সেদিন এখানে মন্দিরে গিয়ে অন্য এক রথের দিনের কথা মনে এল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কৃষ্ণমন্দিরে গিয়েছি। তখন লক্ষণ মহাপাত্র গাইছেন—"জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে..." সমান্তরাল ভাবনার এই সব একান্ত মুহূর্তে হারানো গান নিঃশব্দে বেজে যায়।

হাসপাতালে ডঃ মহান্তির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে।

নেহাত সামনে না পড়লে কেউই কথা বলি না। আমারও ব্যস্ততা চলছে। ক্যানসার পেসেন্টদের খাবার আর নিউট্রিশন সম্পর্কে একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিলাম। এরপর এই হাসপাতালে এশিয়ান ভেজিটেরিয়ান ফুডের সঙ্গে দু/একটা ইন্ডিয়ান রান্না দেওয়া যায় কি না, সে নিয়ে সোফিয়ার সঙ্গে একটা প্রপোজ্যাল লিখছি।

সোফিয়ার সঙ্গে বেশ কয়েকবছর কাজ করছি। কাজের ফাঁকে নানারকম কথা হয়। আজ সোফিয়া জিজ্ঞেস করল—"ধ্রুবা, তুমি লোক্যাল চ্যানেলে ড্যারিয়েনের খবরটা দেখেছ? একজন ইন্ডিয়ান বুড়ো লোককে চাইল্ড মলেস্টেশন চার্জে অ্যারেস্ট করেছিল। দেখলাম কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কমিউনিটির কয়েকজন প্রটেস্ট করছিল। হ্যাভ ইউ হার্ড এনিথিং?"

একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিলাম—"কাগজে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক তো নিজেকে ইনোসেন্ট বলছে। ওর আত্মীয়-স্বজনরা হয়ত প্রটেস্ট্ করছে। আমরা কোনো খবর পাইনি।"

—"রিয়েলি! ইউ ক্যান্ট ট্রাস্ট এনিবডি। চার্চের প্রিস্টদের কথাই ভাবো। কত বছর ধরে ছোট ছেলেগুলোকে সেক্সচুয়্যালি অ্যাবিউজ করে গেছে। তখন তো ভয়ে কেউ কমপ্লেইন্ করতেও পারত না। কি ট্রম্যাটিক এক্সপেরিয়েন্স! আর এখন দ্যাখো বছরে কতগুলো ক্রিমিন্যাল কেস উঠছে।"

—"প্রিস্টদের জেলও হচ্ছে। শুধু ভিকটিমদের কথার ওপর ভিত্তি করেই তো জুরিরা ভার্ডিক্ট দিচ্ছে? এত বছর পরে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টের কোনো প্রমাণ তো নেই?"

সোফিয়া উত্তর দিল—"সাইকোলজিক্যাল ট্রমা, মনে করো ঐ বয়সের ভয়, ঘেন্না, শরীরে ব্যথার কষ্ট। এত বছর পরেও কেউ যদি সেকথা খুলে বলতে পারে, তুমি কি সহজে অবিশ্বাস করতে পারো? তোমার আমার মধ্যে থেকেই তো কোর্টে জুরি সিলেক্‌শন হয়।"

সেদিন হলুদবনের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরছি, দেখলাম সব ফুল প্রায় ঝরে গেছে। দূরে মে ফেয়ার অ্যাভিনিউ এর দুপাশে গোলাপী চেরীগাছগুলো এখনো ফুলে ফুলে ভরে আছে। মনে হয় গোলাপী বলয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বাড়ির সামনে আবীরের গুঁড়োর মতো ঝরা ফুলের পাপড়ি। বসন্ত শেষ হয়ে এল।

স্কুল থেকে ফিরে নীরা বলল—"কাল বিকেলে আকিকোদের বাড়ি নিয়ে যাবে? ও আর আমাদের স্কুলে পড়বে না।"

—"কেন রে? কোথায় চলে যাচ্ছে?"

নীরা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল—"আই ডোন্ট নো। ইভ্‌ন্ আকিকো ডাজ্‌নট্ নো ইয়েট।"

আকিকোর বাবা সিটি ব্যাঙ্কে কাজ করে। নিশ্চয়ই কোথাও ট্রান্স্‌ফার হয়ে যাচ্ছে।

নীরা জিজ্ঞেস করল—"আমি কি ওদের বাড়ি স্লিপ্‌ওভার করতে পারি?"

—"উইক ডে-তে আবার রাত্তিরে থাকার কী আছে? পরশু স্কুল নেই? দেখি, মিসেস মিশিমো আগে ফোন করুক। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।"

৯

মেঘবালিকার জন্যে

নীরা চলে যেতে মধুরা বলল—"আকিকোর জন্যে মন খারাপ। অথচ আগে মনে আছে মা, ওর সঙ্গে কিছুতেই খেলবে না। বেচারা সবে জাপান থেকে এসেছে, ইংলিশ বোঝে না। নীরা ওর ওপর কি বসিং করত!"

আমি বললাম—"সেই আকিকোই আবার বেস্টফ্রেন্ড হয়ে গেল। ওরা চলে গেলে কদিন খুব মিস্ করব। মুখটা দেখছিস না? তোর দাদুর ট্র্যান্সফারেবল জব ছিল। আমারও ছোটবেলার বন্ধুরা হারিয়ে গেছে।"

মধুরা উপদেশ দিল—"তুমি ইন্টারনেটে গুগ্ল সার্চে যাও না। হয়ত কারুর খোঁজ পেয়ে যাবে।"

ভাবতে হাসিই পেল। উদয়ন পাণিগ্রাহী, কুহু রথকে ধ্রুবা সান্যাল রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদের বোধহয় আমার নামও মনে নেই। অথচ একসময় সকাল বিকেল খেলা করেছি। ঝগড়া করেছি। একদিন তো বাঙালি ওড়িয়া নিয়ে হাতাহাতি হওয়ার জোগাড়। কোত্থেকে শিখে এসে উদয়ন আমার মুখের সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে হাততালি দিয়ে শুরু করল—

"বাংগালি টিংটিঙ্গালি মড়া মাছ খায়
মড়া মাছ নাহি পাইলে কুকুর কাটি খায়।"

কি মিথ্যে কথা! আমরা কোনোদিন পচামাছ খাইনি। আমিই বা অপমান সহ্য করব কেন? বানিয়ে বানিয়ে নেচে নেচে বলতে লাগলাম—

"ওড়িয়া তেলকুড়িয়া পকাল ভাত খায়
পকাল ভাত নাই পাইলে বেংগো ধরি খায়।"

উদয়ন কিন্তু রাগছে না। উল্টে হেসে হেসে বলছে—

"কঁড় কহিলি? মু বেংগো খাই? মু তো দেখিলু তু কালি গোটে সাপ্‌পো খাইথিলি।"

সাপ, ব্যাং খাওয়া নিয়ে সেই ঝগড়া শেষপর্যন্ত সুভদ্রানানী এসে থামিয়েছিল।

উদয়ন মাঝে মাঝেই আমাকে জ্বালাতো। নাকি ঐ বয়সেই ডিসক্রিমিনেটিভ অ্যাটিটিউড জন্মে যায়? তখন ওখানে দুটো বাঙালি ক্লাব। বাবা, পালিত জেঠু, শঙ্কর কাকারা মিলে মৈত্রী সংঘ খুলেছেন। সারা বছর ফাংশান হয়। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে সুচিত্রা মিত্র এলেন। আমরা 'শাপমোচন' করলাম। ডাঃ দাশগুপ্তর মেয়ে গৌরীদি কমলিকা। সম্বলপুরের ওড়িশি নাচের মাস্টার বিজয় সৎপতি অরুণেশ্বর। আমরা ফুলের গয়না পরে দুহাতে আলতা মেখে পরের পর নেচে গেলাম। সুপ্রভামাসী তখন চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বউ। আমাদের প্রাইজ দিলেন। ওঁর ছেলে হয়ে উদয়ন যে কি কুচুটে ছিল, পরে তার প্রমাণ পেলাম।

ওড়িয়া কবি উপেন্দ্র ভঞ্জর জন্মদিনে ওখানে ভঞ্জজয়ন্তী হয়েছিল। কটক থেকে কবি, গাইয়ে টাইয়েরা এসেছিলেন। সুপ্রভামাসীদের সঙ্গে আমরাও গেছি। স্টেজে একজনকে মালা পরাল। তাঁর নাম বসন্তমঞ্জরী দেবী। কি সুন্দর নাম! ঠিক করলাম কোনোদিন ঐ নামটা কাউকে দেব। আমার তো কোনো হিংসে নেই। ভাল লাগলে স্বীকার করব না কেন?

কথাটা শুনে উদয়নের কি অহংকার—"আমাদের আরও কত ভালো নাম আছে। কবিদের কথাই দ্যাখ না। আমাদের উপেন্দ্র

ভঞ্জ আশিখানা কবিতা লিখেছিলেন। তোদের রবীন্দ্রনাথ কটাই বা লিখেছে?"

এই সব বোকার মতো কথা শুনলে গা জ্বালা করবে না? তার ওপর, আমাদের বিখ্যাত মানুষদের ওড়িয়া বলে ক্লেইম্ করতো। নেতাজী নাকি ওড়িয়া। কারণ, কটকে বাড়ি ছিল। চৈতন্যদেবও ওড়িয়া। কারণ, বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র। একদিন রেগে গিয়ে বললাম—"বল্ না, আমিও ওড়িয়া। তোদের উড়িষ্যায় থাকি।"

উদয়ন বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল—"না, তুই হবি ক্যারা বাংগালি।"

—"বাজে বকিস না। আমি ক্যারাবাঙালি হতে যাবো কেন? তোর সঙ্গে ঝগড়া করার জন্যে বুরলায় বসে থাকব? আমরা কলকাতার বাঙালি। বাবা ওখানেই ফিরে যাবেন।"

উদয়ন চাল মেরে বলল—"মু লন্ডন চলি যাউছি।"

আরও ছোট বয়সের সুখস্মৃতিও কত আছে। আমরা দলবেঁধে একটা ছোট্ট পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। উদয়নের হাতে খবরের কাগজের পতাকা। আমাদের হাতে লিকলিকে সরু গাছের ডাল। ওর পেছনে পেছনে গাইতে গাইতে উঠছি—নান্হা মুন্না রাহি হুঁ, দেশকা সিপাহি হুঁ, বোলো মেরে সঙ্গ্ জয় হিন্দ জয় হিন্দ। তারপর পাহাড়ের মাথায় উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনবার 'জয়হিন্দ'। একদিন টিলার ওধারে বনবেড়ালের মতো একটা বিকট জন্তু দেখে উদয়ন বাঘ-অ-অ, বাঘ-অ বলে পতাকা ফেলে দৌড়োতে লাগল। পরে আমাদের শিখিয়ে দিল বাড়ি গিয়ে

বলবি বাঘ দেখেছি। মাঝখান থেকে আমাদের পর্বত অভিযান বন্ধ হয়ে গেল।

সেই উদয়ন পাণিগ্রাহী এখন কোথায়? অত দেশভক্তি নিয়ে পলিটিক্‌সে ঢুকেছে বোধহয়। নাকি শেষপর্যন্ত লন্ডনেই গেছে?

জুনের শেষে মধুরাদের স্কুল বন্ধ হল। হাসপাতাল থেকে দু সপ্তাহ ছুটি নিয়েছি। কাল আমাদের সানফ্রানসিসকোর ফ্লাইট। গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তারই মধ্যে স্ট্যামফোর্ড অ্যাডভোকেটের ক্রাইম সেকশনে মাধব মিশ্রর খবরটা চোখে পড়ল। কোর্টে একটা হিয়ারিং হয়ে গেছে। ডিফেন্স বলেছে মাধব মিশ্র কোনো যৌন প্রবৃত্তি থেকে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরেনি। নাতনির বন্ধুকে স্নেহ করে পিঠে হাত দিয়েছিল। মেয়েটি তার উদ্দেশ্য বোঝেনি বলে মার কাছে অন্য কথা বলেছে। মাধব মিশ্র কখনোই তার বুকে হাত দেয়নি বা জোর করে চুম্বন করেনি। এর পরের হিয়ারিং অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে।

ক্রাইম সেক্‌শনের ছোট খবরটা মাথার মধ্যে ঘুরছে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, সুরঞ্জন যতই বাধা দিক, কেস্‌টা থেকে একেবারে সরে থাকতে পারব না। ছুটি থেকে ফিরে এসে যেভাবেই হোক পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে দেখা করব। কেসটা বোধহয় যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে দাঁড়াতে পারছে না। বেনিফিট অফ্ ডাউটে লোকটা হয়ত ছাড়া পেয়ে যাবে। আমি কি নিজে থেকে কোনো স্টেটমেন্ট দিতে পারি না? জানি, এ ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ডিফেন্স থেকে আপত্তি তুলবে। জাজ হয়ত প্রসিকিউশনের প্রস্তাব কোর্টে তুলতেই

দেবেন না। তবু চেষ্টা করতে হবে। এখানে বুরলার সেই ছোট সমাজ নেই। বাবার বস পাণিগ্রাহী সাহেবের সঙ্গে অশান্তির ভয় নেই। সুব্রতদাও তো শেষপর্যন্ত দিদিকে বিয়ে করল না! মার সঙ্গে সুপ্রভামাসীর কবেই বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। শুধু মাধব মিশ্রের জন্যে শেষ পর্বটা তিক্ত হয়ে গেল। এত বছর পরে কি অদ্ভুতভাবে সে লোকটা এখানেই ধরা পড়ল। ডেস্‌টিনি! ওর ভাগ্য ওকে টেনে এনেছে। ওর হিয়ারিং চলার সময় একবার আমাকে কোর্টে যেতেই হবে। সুরঞ্জন শেষপর্যন্ত বাধা দেবে না। মধুরাকে আমি বুঝিয়ে বলেছি। শুধু মহান্তিদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছাড়া আর আমার হারানোর কিছু নেই। সারুর জন্যে এখনো অবচেতনে যে যন্ত্রণা অনুভব করি, মাধব মিশ্র শাস্তি পেলেও তা দূর হবে না। কিন্তু, তবু জানব বিচার বলে কিছু আছে।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নেভাডা, অ্যারিজোনা ঘুরে দু সপ্তাহ বাদে বাড়ি এলাম। মধুরা, নীরার আনন্দ, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাসের মাঝে দিনগুলো নিরবচ্ছিন্ন প্রসন্নতায় ভরে থাকার কথা। প্রায় সেরকমই কেটে গেল। শুধু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল বেড়াতে যাওয়ার আগে সুরঞ্জনকে আমার প্ল্যানটা বলা উচিত ছিল। তাহলে কোর্টে গিয়ে স্টেটমেন্ট-এর কথাটা বলে আসতে পারতাম। হয়ত দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু ওখানেও বলার সুযোগ পেলাম না। বেড়াতে বেরিয়ে মেয়েদের সামনে তর্কাতর্কি ভালো লাগে না। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মাধব মিশ্রকে জেলে পাঠাব বললে সুরঞ্জন তখনই ঝগড়া লাগাত। তাই বাড়ি

ফিরে এসে কথাটা ভাঙলাম। খানিক গজগজ করে সুরঞ্জন বলল—“যা ইচ্ছে করো। তবে বুদ্ধি থাকলে পাবলিক হিয়ারিং-এ গিয়ে বোসো না। স্টেটমেন্ট যদি নিতে চায়, সিক্রেট্‌লি দিও। কন্ডিশনটা প্রথমে বলে নেবে। তাও হয়ত কোর্ট থেকে শমন পাঠাবে।”

—“পাঠালে যাব। তুমি ভাবছ মহান্তিদের আমি ভয় পাব?”

—“ভয় পাবে কেন? শুধু খেয়াল রেখো, কোনো সার্জারি করাতে হলে নিজের হাসপাতালে যেও না। আমাকেও পাঠিও না। মহান্তি অ্যানেস্‌থেসিয়ার এমন ডোজ দেবে!”

আমি হেসে ফেলেছি—“যাঃ, কোনো ডাক্তার সেটা করে? অ্যাক্‌সিডেন্টাল ওভার ডোজ বলে চালাতে গেলেও ম্যাল্‌প্র্যাকটিস্‌ মামলায় পড়ে যাবে না?”

সুরঞ্জন বলল—“তুমি গাউন পরে কোর্টে চলে যাও না? একাই সওয়াল জবাব করে বুড়োটাকে ফাঁসিয়ে দাও। কি ক্যালিবার মাইরি।”

এতক্ষণে বুঝলাম ওর মেজাজ ঠান্ডা হয়েছে। এবার আর বুদ্ধি, পরামর্শ নিতে হবে। আগে তো উকিলের নামটা জোগাড় করি।

মেয়েদের স্কুল বন্ধ। আবার অ্যানেট্‌কে বাড়িতে রেখেছি। দিনের বেলা ওর সঙ্গেই ওরা সুইমিং আর সকার প্র্যাকটিসে যায়। আমি একদিন স্ট্যামফোর্ড সুপিরিয়র কোর্টে গিয়ে লইয়ার মিস্টার সিলভারম্যানের সঙ্গে দেখা করে এলাম। প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন। ভারতীয় হয়ে ভারতীয়র বিরুদ্ধে যাচ্ছি বলেই বোধহয়, সরাসরি আমার আগ্রহের কারণটা জানতে চেয়েছিলেন।

পুরনো ঘটনাকে এত বছর বাদে কীভাবে এবারের কেসে কাজে লাগাবেন, সেই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। তারপর বললেন—স্টেটমেন্ট রেকর্ড করবেন। তার আগে ওঁদের অফিসে তার কপি জমা দিতে হবে। স্টেট উইটনেস্ হিসেবে এখন লিগ্যালি আমাকে ডাকা যাবে না। পরে জাজ রাজি হলে ডেকে পাঠাতে পারেন।

এবার একটু দ্বিধা হচ্ছে—"আমি তো প্রথমেই বলেছি, ঘটনাটা সিক্রেটলি জানাতে চাই। আমার মেয়েরা এখনো ছোট। এই কেসটায় ডিরেক্ট্লি ইন্ভল্ভড্ হওয়ার অসুবিধে আছে। তাছাড়া মাধব মিশ্রের সান-ইন-ল আমাদের হসপিট্যালের ডাক্তার। বুঝতেই পারছেন, আমার ইচ্ছে থাকলেও ঠিক কোর্টে অ্যাপিয়ার করতে চাইছি না।

সিলভারস্যান চতুর লোক। চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে করতে বললেন—"আপনি চান লোকটার শাস্তি হোক? আর এও চান, কাগজে নামটাম বেরোবে না। তাই তো? ঠিক আছে। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট্।"

হাসাপাতালের কাজের পরে বাড়ি এসে রান্নাবান্না করি। সন্ধেবেলা খাওয়া দাওয়া মিটলেও মধুরা এখন বেশ দেরি করে শুতে যায়। যতক্ষণ না ও ওপরে যাবে, নীরাও ঘুমোতে যাবে না। সুরঞ্জন ওদের সঙ্গে 'চেস্' খেলে। টিভিতে সকার, বেস্বল গেম দ্যাখে। আমি [illegible]খার সুযোগ পাই না। সময় থাকলেও পুরনো ঘটনা গুছিয়ে নেওয়া সহজ নয়। লেখালেখির তো অভ্যেস নেই। স্টেটমেন্ট লিখতে বসে ঘটনার খেই হারিয়ে

যাচ্ছে। কোথা থেকে শুরু করব? মাধব মিশ্রকে প্রথম কবে দেখেছিলাম...কিন্তু ঘটনার তো পটভূমি থাকে। হঠাৎ মাধব মিশ্রকে আনব কী করে?

এই সব ভাবতে ভাবতে পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখন সম্বলপুর স্টেশনে নেমে যাই। তারপর জিপে উঠে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হীরাকুঁদ ড্যাম প্রজেক্ট। আমি অবশ্য ঘন জঙ্গল দেখিনি। দিদি ছোটবেলায় দেখেছিল। বাবা তখন বুরলায় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র। কাছেই চিফ্ ইঞ্জিনিয়র যুধিষ্ঠির পাণিগ্রাহীর বাংলো। ওঁরা সম্বলপুরের লোক। সুপ্রভামাসী বাংলা বোঝেন। সম্বলপুরের গেইটি টকিজে, লক্ষ্মী টকিজে বাংলা সিনেমা এলে মাকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে যান। ওঁদের বড় ছেলে সুব্রতদা কটকে ডাক্তারি পড়ে। মেয়ে সুভদ্রা আমার দিদির বন্ধু। উদয়ন আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ে। একটু বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম সুব্রতদা দিদিকে বেশি পছন্দ করে। হস্টেল থেকে যখন তখন ফোন করে। সুপ্রভামাসী মাকে বলেন তোমার বড় মেয়েটা বেশি সুন্দর। কটক থেকে উদয়নের দিদিমা এলে দিদি সেজেগুজে ঘুরে আসে। মার ব্যাপারটা পছন্দ নয়। শুনছিলাম দিদিকে কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দেবেন।

এর মধ্যে সুপ্রভামাসীর ভাই মাধবমামার আসা যাওয়া শুরু হল। কটক থেকে ব্যাবসার কাজে এদিকে আসেন। মাঝে মাঝে উদয়নদের বাড়িতে থাকেন। আমরা ওঁর কাছ থেকে লজেন্স চকলেট পাই। খালি একটাই বাজে লাগে। চট্ করে কাছে টেনে নিয়ে গালে গাল ঘষে দেন। মুখে সিগারেটের বিশ্রী গন্ধ।

সেবার লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন উৎকল সোসাইটির মুনলাইট পিক্‌নিক্‌। সন্ধেবেলা সুপ্রভামাসীদের সঙ্গে মহানদীর ধারে যাব। উদয়ন তখন থেকেই কালীপুজোর বাজি কিনে কিনে জমাচ্ছে। বলল পিকনিকে তুবড়ি, কালিপটকা নিয়ে যাবে।

বাবা আর আমি সময়মতো তৈরি হয়েছি। দিদি জেদ ধরল পিকনিকে যাবে না। আসলে বিকেলে মার কাছে বকুনি খেয়েছে। সুব্রতদা পুজোর পরে কটকে ফিরে গিয়ে রোজ ফোন করছে। দিদি অনেকক্ষণ ফিশফিশ করে ফোন এনগেজড রাখে। বাবা অফিস থেকে দুদিন লাইন পাননি। মা সেই নিয়ে বকেছেন। সুপ্রভামাসীদের বাড়ির পাশে থাকাই কাল হয়েছে বলেছেন। তাই দিদির এত রাগ। মা বললেন তোমাকে পিকনিকে যেতে হবে না। নিজেও গেলেন না।

যখন মহানদীর ধারে পৌঁছলাম, আকাশে সোনার থালার মতো চাঁদ ভেসে আছে। বালির ওপর রুপোলি জ্যোৎস্নার আলোছায়া। পাহাড়ি নদীর খরস্রোতের ছলছল শব্দ। সারা শরীরে জলের গন্ধ মেখে বালিয়াড়ি ভেঙে নেমে চলেছি। শালবনে ঝড়ের হাওয়া উঠেছে। আমার চুল উড়ছে। ফ্রকের ঘের ফুলে উঠে ঘাগরার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। দূরে কুহুরা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে হাত তুলে ডাকছে—ধ্রু-উ-উ-বা-, এইটি আস...

এত রাতে জলে নামা বারণ। উদয়ন বাজি পোড়াতে ডাকল। তখনো খাওয়া হয়নি। সুপ্রভামাসী, অপর্ণামাসী, মিলিনানিরা শতরঞ্চির ওপর প্লেট সাজাচ্ছেন। আমার একটু একা একা

লাগছে। টেপরেকর্ডারে জ্বলতে হ্যায় জিস্‌কে লিয়ে শুনতে শুনতে ফোন কানে নিয়ে দিদির কান্নাকান্না মুখটা ভেবে নিলাম। কাল বোধহয় ঐ সিনটাই দেখতে হবে। মা আজ যা রাগারাগি করলেন। আমার এবার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে।

উদয়নের ডাকাডাকিতে বাজি পোড়ানো দেখতে গেলাম। তুবড়ি থেকে আলোর ফোয়ারা উঠছে। মন্দিরা আর গুঞ্জার হাতে রঙমশাল। নদীর জলে আগুনের অজস্র ফুল্‌কি বিন্দু বিন্দু আলোর মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দুমদাম পট্‌কার শব্দ। ওরা হাউই-এর মতো কি একটা বাজি ছাড়ল! নাঃ, এত আওয়াজ, ধোঁওয়া, আগুন আর ভালো লাগছে না। ওপরে উঠে দেখি বাবা আমায় খুঁজছেন কিনা। কেউ তো খেতেও ডাকছে না।

আবার বালিয়াড়ি পার হয়ে ওপরে উঠছি। মাঝে মাঝে শক্ত কাঁটাঝোপ। বালিতে পা বসে যাচ্ছে। এখান দিয়েই কি নেমে এসেছিলাম? হঠাৎ পেছন থেকে কেউ জোরে টেনে নিল। চম্‌কে ফিরে দেখি মাধব মামা। আমাকে সাবধান করে বলল অন্ধকারে ভুল দিকে চলে গেছি। তারপর একহাতে জড়িয়ে হাঁটতে লাগল। মাধবমামাকে অনেকক্ষণ আগে একবার দেখেছিলাম। আমাকে কি দূর থেকে দেখতে পেয়েছে? ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে কোন্‌দিকে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমাকে চেপে ধরে জোরে জোরে চুমু খেতে লাগল। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিজেকে ছাড়াতে পারছি না। জামার ভেতর একটা শক্ত হাত আমার বুক মুচড়ে ধরেছে। ভয়ে, যন্ত্রণায় চিৎকার করে

উঠেছি। মাধব মামা ঝট করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল—"কাউকে বলবি না। লোকে তোকেই খারাপ মেয়ে ভাববে।" তারপর চোরের মতো পালিয়ে গেল।

ঐ ঘটনার কথা দিদি ছাড়া কাউকে বলতে পারিনি। ভয়ে, লজ্জায় কতদিন যে লুকিয়ে কেঁদেছি। আমারই তো দোষ। কেন ওকে জড়িয়ে ধরতে দিলাম? কেন ওর কাছ থেকে লজেন্স, চকলেট নিতাম? কেন সেদিন অন্ধকারে ওর কথায় বিশ্বাস করলাম? আসলে ওর মতলব বোঝার মতো ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌ ম্যাচিওরিটি কিছুই আমার ছিল না। একটা অভিজ্ঞতায় যেন রাতারাতি বড় হয়ে গেলাম। দিদি না বললেও মার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। দিদি আমাকে বোঝাল এখন মাকে যেন কোনো কথা না বলি। মা সুপ্রভামাসীর কাছে ছুটে যাবেন। ওঁরা তো মানবেন না। ভীষণ অশান্তি হবে। বাবা পাণিগ্রাহী সাহেবের আন্ডারে কাজ করেন। হয়ত বাবার চাকরির ক্ষতি হবে। তার চেয়ে সুব্রতদাকে জানানো উচিত। ফ্যামিলির মধ্যে ওই যা করার করবে। ক্রিসমাসের ছুটিতে সুব্রতদা আসছে। দিদি তার আগে ওকে ফোনে কিছুটা আভাস দিয়ে রাখবে।

উদয়নদের বাড়ি আর যাই না। আমার নতুন প্রাইভেট টিউটর অগাস্টিন বিশ্বাস অনেক হোম-ওয়ার্ক দেন। স্কুল থেকে ফিরে পড়তে বসি। মন ভালো লাগে না।

সেদিন সারু এসে খবর দিল উদয়নের দাদু মারা গেছেন। ভোরবেলা ফোন পেয়ে ওরা সম্বলপুর চলে গেছে। ওদের

শোবার ঘরের চাবিগুলো মার হাতে দিয়ে সারু জিজ্ঞেস করল—"বাগানে জল দিয়ে দেব?" তারপর পাইপ হাতে ঘুরে ঘুরে বাগানে জল দিতে লাগল। সন্ধেবেলা ওর বাবা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন।

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা কচুরি ভাজছেন। আমার খাওয়া হলে বললেন— "যা, সারুকে ডেকে নিয়ে আয়। কাল ভ্রমর আটা চেয়ে নিয়ে গেল। ওরা বোধহয় মাইনে টাইনে দিয়ে যেতে পারেনি।"

উদয়নদের বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে আউট হাউসের দিকে গেলাম। ভ্রমর এ সময় থাকে না। মালীর ঘরটা খোলা পড়ে আছে। সারু গেল কোথায়? বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজাগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ যেন কান্নার শব্দ শুনলাম। ভয়ে শরীর শিউরে উঠেছে। পরমুহূর্তে মনে হল সারু কাঁদছে। কোথায়? কোন ঘরে? ছুটে জানলার ধারে গিয়ে দুহাতে পাল্লা ঠেলে দিতে সেই কুৎসিত দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। বিছানার ওপর সারুর শীর্ণ উলঙ্গ শরীরে শয়তানটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বিশ্রীভাবে শরীর ঝাঁকাচ্ছে। সারুর অসহায় দুটো হাতের মুঠো লোকটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। আচমকা জানলা খোলার শব্দে, আমার চিৎকারে লোকটার হুঁশ ফিরে এল। খাট থেকে নেমে দরজা খুলে পাশের বাথরুমে ঢুকে পড়ল। সারু তলপেটে হাত রেখে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। গোঙানির মতো কান্নার আওয়াজ। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছি।

—"সারু! সারু! কী করে এখানে এলি? ওদের মামাটা কি বাড়িতে ছিল?"

সারু শুধু মাথা নাড়ল। আমার ভীষণ ভয় করছে। সারু কথা বলছে না কেন? ও মরে যাবে না তো? আমি কি করে ওকে বাড়িতে নিয়ে যাব? লোকটা যদি আবার বেরিয়ে আসে? ঐ চিন্তা থেকেই মনের মধ্যে সাহস ফিরে এল। আজ আমি মাকে সব বলে দেব। আগে সারুকে ধরে ধরে বাড়ি নিয়ে যাই।

পিঠ ছেঁড়া জামা দিয়ে ওর শরীরটা কোনো মতে ঢেকে দিয়েছি। সারু সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। কাঁদতে কাঁদতে হেঁচ্‌কি তোলার মতো শব্দ করছে। পায়ের ওপর দিকে যেন রক্ত দেখতে পেলাম। কোনো মতে ধরে ধরে ওকে বাড়ি পর্যন্ত এনে নিজেই হাউমাউ করে কাঁদছি—মা, শীগ্‌গির এসো, সারুকে নিয়ে যাও। সারু মরে যাচ্ছে...

মা সারুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে বাবাকে ফোনে জানিয়ে গেছেন। সন্ধের পর ভ্রমর সারুকে ডাকতে এল। আমি আর দিদি উদভ্রান্তের মতো বসে আছি। সারুকে যখন নিয়ে এসেছিলাম, সে সময় আমাদের কাজের লোক যমুনা সবই দেখেছে। যমুনা ভ্রমরকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কথা বলছে। বাবা যখন মা আর সারুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে এলেন, ভ্রমর তখনো অন্ধকার বারান্দায় ভূতের মতো বসে আছে। মেয়েকে দেখে মাথা চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

মা বোঝালেন কেঁদে কিছু হবে না। ভ্রমর বাবার সঙ্গে থানায় যাক। মাধব মিশ্রর নামে ডায়েরি করে আসুক। মা হাসপাতালের

রিপোর্টটা বাবার হাতে দিলেন—"যাও, ডি এস পির সঙ্গে দেখা করো। ওরা গরিব মানুষের কথা বিশ্বাস করবে না। তোমাকে কেস ফাইল করতে হবে।"

বাবা বোঝাতে চেষ্টা করলেন—"আমি সরস্বতীর গার্জেন নই। ভ্রমরকে রেপ্‌চার্জের কমপ্লেইনট দিতে হবে। তাতেও হয়ত কেস নিতে চাইলে না। উইটনেস দরকার হবে। তুমি কনসিকোয়েন্সটা ভেবে দেখেছ?"

উত্তেজনায় মার গলার স্বর কাঁপছে—"জানি। দরকার হলে ধ্রুবাকে নিয়ে যাব। শুধু ভয়! সমাজের ভয়! চাকরির ভয়! আমরা কি মানুষ? তোমার মেয়ে হলে কী করতে?"

ভ্রমর হঠাৎ ছুটে এসে মার পা জড়িয়ে ধরল। বার বার বলতে লাগল থানায় যাবে না। পুলিশের কাছে গেলে সাহেব ওকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবেন। মালীর কাজ, অফিসে খালাসির চাকরি সব চলে যাবে। ওরা না খেয়ে মরবে।

মা ভরসা দিলেন—"আগেই ভয় পাচ্ছ কেন ভ্রমর? পাণিগ্রাহী সাহেব তেমন মানুষ নন। হয়ত ওঁর শালার স্বভাব-চরিত্র জানেন। তোমার ওপর শোধ তুলবেন না।"

তবু ভ্রমর থানায় যেতে রাজি হল না। শেষকালে বলল সারুর কথাটা জানাজানি হলে ওরা গ্রামে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবে না। ওর বউ সারুকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"তাহলে তুমি পাণিগ্রাহী সাহেবের বাড়িতে ফিরে যাও। ওঁরা সম্বলপুর থেকে না আসা পর্যন্ত সারু আমার কাছে থাক।"

সারু আর উদয়নদের বাড়ি ফিরে যায়নি। ওর শরীরটা ঠিক হওয়ার পর ভ্রমর ওকে ঢেনকানলে রেখে এসেছিল। সৎমার কাছে মারধর খেয়ে আবার গ্রামের লোকের সঙ্গে এখানে চলে এল। আমাদের বাড়িতে থাকার ইচ্ছে। কিন্তু বাবা তখন ট্রান্সফারের চেষ্টা করছেন। সারুকে হেডমিস্ট্রেস্ উমা দত্ত ওঁর বোনের বাড়ি হীরাকুঁদে পাঠিয়ে দিলেন। বারো বছরের সরস্বতী জেনার আর কোনো খবর পাইনি।

সম্বলপুর থেকে সুপ্রভামাসীরা ফেরার পর মা প্রথম কদিন কোনো কথা তুললেন না। ভ্রমরের কাকুতি-মিনতিতে সারুর ঘটনাও জানাতে পারছেন না। শুধু আমার কথাটা বলার জন্যে ওঁদের বাড়ি গেলেন। সঙ্গে আমাকেও যেতে হল। মা চান না, আমার অসাক্ষাতে সুপ্রভামাসী ঘটনাটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু সামনে থেকেও তাই হল। উনি ভীষণ রেগে উঠলেন। ওঁর ধারণা আমি এত পেকে গেছি যে মাথায় বাজে চিন্তা ঢুকেছে। মাধবের সামান্য আদরকে বদমতলব ভেবে মার কাছে মিথ্যে নালিশ করেছি। মাধব তো ইদানীং আসেও না।

ইচ্ছে করছিল সারুকে ডেকে আনি। আমি সেদিন কি দেখেছিলাম লজ্জায় বলতে পারব না। সে কথা জানানোও যাবে না। অথচ আমি যে মিথ্যে বলিনি তা প্রমাণ করার উপায় নেই। সুপ্রভামাসীর সঙ্গে মার বেশ কথা কাটাকাটি হল। উনি বললেন—"ধ্রুবাকে আর এখানে পাঠিও না। কোন্‌দিন উদয়নের নামেও দোষ দেবে।" মা শান্তভাবে উত্তর দিলেন—"সুব্রতকেও

বলবেন ইন্দিরাকে যেন ফোন না করে। আপনাদের দুশ্চরিত্র ফ্যামিলিতে আমরা মেয়ের বিয়ে দেব না।”

দু বাড়ির এতদিনের সম্পর্ক মাত্র একটা ঘটনায় চিড় খেয়ে গেল। পাণিগ্রাহী সাহেব কখনো বাবার কাছে এ প্রসঙ্গ তোলেননি। উদয়ন কতটুকু বুঝেছিল জানি না। স্কুলে যেটুকু দেখা হত। সুভদ্রা নানি সম্বলপুর কলেজে চলে গেল। শুধু ও আর সুব্রতদা ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছিল। দিদি সুব্রতদাকে সারুর ঘটনাও বলে দিয়েছিল। আমার সম্পর্কে সুপ্রভামাসীর মন্তব্য নিয়ে কটুকথা শুনিয়েছিল। এরপর কি বাল্যপ্রেম বেঁচে থাকে? একদিকে মার প্রচণ্ড আপত্তি, অন্যদিকে সুপ্রভামাসীর অপমানের জ্বালা। সুব্রত পাণিগ্রাহী দিদিকে বিয়ে করার সাহসই পেল না।

এক বছরের মধ্যে বাবা ভিলাইতে বদলি হয়ে গেলেন।

এতকাল পরে কোর্টের জন্যে স্টেটমেন্ট লিখতে বসে স্মৃতির অতল গর্ভ থেকে কত মুখ, কত নাম উঠে আসছে। কখনো তুচ্ছ, অবান্তর ভাবনায় ভেসে চলেছি। শেষপর্যন্ত সুরঞ্জন হাল ধরল। মাধব মিশ্রর সঙ্গে আমার আর সরস্বতী জেনার ঘটনা দুটোকে মোটামুটি সময় টময় হিসেব করে গুছিয়ে লিখলাম। ল-ইয়ার সিলভারস্যানের অফিসে জমাও দিয়ে এসেছি।

সেদিন হসপিট্যালে ডঃ মহান্তির সামনে পড়ে ভদ্রতা করে মিসেস মিশ্রর খবর নিলাম। বললেন—“হাঁটাচলা করছেন। তবে মনের দিক থেকে টোট্যালি স্ট্রেস্‌ড্ আউট। বোধহয় জানেন আমরা একটা লিটিগেশনের ঝামেলায় পড়েছি। উই আর রিয়েলি গোইং থ্রু দ্য হেল্।”

কথা শেষ না করেই মহান্তি এলিভেটরে উঠলেন। মনে হল না আমার স্টেটমেন্ট দেওয়ার খবরটা পেয়েছেন। হয়ত ধরেই নিয়েছেন খবরের কাগজ পড়ে আমরা কেসটা জেনে গেছি। সত্যি! ভদ্রলোক যে কি অবস্থায় পড়েছেন। বেইল নেওয়ার খরচ, ডিফেন্স অ্যাটর্নিদের ফি, হাজার হাজার ডলার বেরিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর এরকম হিউমিলিয়েশন! শ্বশুরটা চোর, জোচ্চর হলেও এত লজ্জায় পড়তে হত না।

মাঝে মাঝে কাছাকাছি শহরে, প্রভিডেন্সে, বস্টনে বাঙালি বন্ধুদের বাড়ি যাই। কোথাও এসব আলোচনা করি না। শুধু একেকটা হিয়ারিং-এর খবর পেলে বম্বেতে দিদিকে ফোন করি। ওর কিন্তু আগের মতো রাগ, দুঃখ কিছুই অবশিষ্ট নেই। নাকছাবির সেই ছোট্ট ফুটোটা মিলিয়ে যাওয়ার মতো ওড়িশার দিনগুলোও বোধহয় স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছে। আমি জানি, আজ মা বেঁচে থাকলে বলতেন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। নয়তো লোকটা ঐ দেশে গিয়ে ধরা পড়ল। তোমায় যদি ডাকে কোর্টে তো যেতেই হবে। দেখি, ধর্মের কলের চাকা একটু তো ঠেলে দিয়েছি। এখন ধর্মাবতার যা করেন।

কেস শেষ হতে প্রায় এক বছর লাগল। এগারো বছরের মেয়েকে তো কোর্টে আনবে না। আলাদা করে আগে ওর স্টেটমেন্ট নিয়ে কেস শুরু হয়েছিল। হিয়ারিং-এর দিন ওর বাবা, মা, আত্মীয়রা আসত। কেসটা প্রসিকিউটররা প্রায় গুছিয়ে এনেছিল। ডিফেন্সও নানা যুক্তি দিয়ে মাধব মিশ্রকে নির্দোষ প্রমাণ

করার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই হাস্যকর 'স্নেহের' যুক্তি। আমেরিকান কাস্টম না জেনে নাতনির বন্ধুকে আদর করতে গিয়েছিলেন। এই ভুল বা নির্দোষ স্পষ্ট কোনো যৌন অপরাধ নয়। অ্যাকিউজড্ যে আসলে ইনোসেন্ট, জাজ আর জুরিরা নিশ্চয়ই তা বিবেচনা করবেন।

এই মোক্ষম মুহূর্তে আমাকে কোর্টে সাক্ষী দিতে ডাকল। যদিও নতুন মামলায় তিন যুগের পুরনো ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা চলবে না বলে ডিফেন্স আমার স্টেটমেন্ট বাতিল করতে চেষ্টা করেছিল। জাজ শেষপর্যন্ত প্রসিকিউটরের অনুরোধ রাখলেন। কারণ ঘটনাগুলো অসংলগ্ন নয়। মাধব মিশ্রের অতীতের যৌন বিকৃতির ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে ওর সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল ইভ্যালুয়েশন হবে।

ফাইনাল হিয়ারিং-এ নিজের কথা, সরস্বতীর রেপ্-এর সেই বীভৎস দৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে এতবছর পরেও নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না। ডিফেন্স অ্যাটর্নির জেরায় জেরায় বিধ্বস্ত অবস্থা! অনুরাধার সামনে ওর বাবার নগ্ন চেহারাটা খুলে ধরছি, এই অপরাধবোধও কি কাজ করছিল না?

আমার স্টেটমেন্টের বাইরে সেদিন জাজ আর জুরিদের কাছে শুধু একটা আবেদন রেখেছিলাম—ইয়োর অনার, আমি চাই না কোনো ছোট মেয়ের জীবনে, আমার মেয়েদের জীবনে আমার মতো, সরস্বতী জেনার মতো ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হোক।

জুরিরা মাধব মিশ্রকে দশবছরের জেলটার্ম দিতে চেয়েছিলেন।

লোকটার বয়স আর অসুস্থতার জন্যে জাজ সাতবছরের জেল দিলেন। মহান্তিরা অ্যাপিল করবেন কি না জানি না।

স্ট্যামফোর্ড সুপিরিয়র কোর্ট হাউস থেকে বাড়ি ফেরার পথে সুরঞ্জন বললে—"আমি ভাবতে পারিনি লোকটার এত বছর জেল হবে! বুড়ো লোক, বছরখানেক জেল খাটিয়ে কাউনসেলিং করিয়ে টরিয়ে ছেড়ে দেবে ভেবেছিলাম। তোমার কেসটা না থাকলে হয়ত তাই-ই হত।"

আমি তখনও সারুর কথা ভাবছিলাম। মধুরা, নীরার মতো পৃথিবীর অসংখ্য মেঘবালিকার কথা।